৪০বর্ষ • ৪র্থ সংখ্যা • অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০

সূচিপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| বিশেষ সংখ্যা ঃ কিছু কথা | | ২ |
| উৎস মানুষ-এর ৪০ বছর | সতীশচন্দ্র মণ্ডল | ৫ |
| প্রস্তাবনা | | ৬ |
| মডার্ন মেডিসিন বনাম হোমিওপ্যাথি | অর্ক বৈরাগ্য | ৮ |
| হোমিওপ্যাথিঃ আলোচনা | সৌম্যকান্তি পণ্ডা | ১৩ |
| রোগ সেরে গেল | সব্যসাচী সেনগুপ্ত | ১৫ |
| নতুন বোতলে পুরনো চালাকি | গৌরব সাহা | ১৭ |
| হ্যানিম্যানের ঐতিহাসিক ভুল | শুভাশিস চিরকল্যাণ পাত্র | ২২ |
| ভৌত রসায়নের দৃষ্টিতে | রুদ্রনারায়ণ সমাজদার | ২৫ |
| টিউমার নিয়ে ধুন্ধুমার | সৌম্যকান্তি পণ্ডা | ২৮ |
| হোমিওপ্যাথি -ইতিহাস | অর্ক বৈরাগ্য | ৩০ |
| ফিরে দেখার আর্জি | অঞ্জনকুমার সেনশর্মা | ৪৬ |
| হোমিওপ্যাথি নিয়ে | বিষাণ বসু | ৫০ |
| বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা | | ৬২ |
| পরিশিষ্ট ১ - ৩ | | ৬৩ |
| সংগঠন সংবাদ | | ৬৬ |


**সম্পাদক**
**সমীরকুমার ঘোষ**
**অতিথি সম্পাদক**
**অর্ক বৈরাগ্য**

রেজিস্টার্ড অফিস : বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪

**কার্যালয়**
**খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন**
**বি ৪, এস - ৩, নারায়ণপুর**
**পোঃ (আর গোপালপুর) কলকাতা- ৭০০১৩৬**

**ফোন : ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৮৯০২৪১২২৯০/৮৭৭০৬৬৪৭২**
**ওয়েবসাইট : www.utsomanush.com/ই - মেল : utsamanush1980@gmail.com/ফেসবুক : http://www.facebook.com/utsomanush/**
**ISSN 0971-5800/RN.37375/80**

# অতিথি সম্পাদকের ডেস্ক থেকে

সাম্প্রতিককালের করোনা মহামারী গত ৭-৮ মাসে গোটা পৃথিবীর মানচিত্র তথা চালচিত্রে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে। জাতীয়-আন্তর্জাতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতির পাশাপাশি চিকিৎসাব্যবস্থা তথা চিকিৎসাবিজ্ঞানের একাধিক নড়বড়ে দিক এতে করে চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সাময়িক থমকে গেলেও বর্তমানে পৃথিবী জুড়ে বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকরা যে অভূতপূর্ব দক্ষতায় এই মহামারীর কার্যকর চিকিৎসা তথা প্রতিষেধক আবিষ্কারের নিরন্তর খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছেন তাকে কুর্নিশ জানাই।

পাশাপাশি মানুষ তার স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের বশে কার্যকর চিকিৎসা ও প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্যে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সময় আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানকে না দিয়ে চটজলদি সমাধান চাইছে এবং বারংবার ধৈর্যচ্যুত হচ্ছে ও যে কোনো ব্যক্তি (সে চিকিৎসা শাস্ত্রের কিছু জানুক বা না জানুক) বা প্রতিষ্ঠান (সেটি যুক্তিসম্মত বিজ্ঞানসাধনা করুক বা না করুক) যখনই কোনো 'ম্যাজিক' ওষুধ, পথ্য বা চিকিৎসা পদ্ধতির পরামর্শ দিচ্ছে মানুষ চোখ-কান বুজে সবদিক না বিচার করেই সেটিকে গ্রহণ করতে সচেষ্ট হচ্ছে। করোনা মহামারীর পাশাপাশি ফেক নিউজের যে মহামারী এই কয়েকমাসে চোখে পড়েছে তার উৎসও কিন্তু এখানেই।

বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা ব্যবস্থা ছাড়া বাকি যে চিকিৎসা ব্যবস্থার রমরমা ভারত তথা বিশ্বে দেখা যায় তাদের একসাথে কম্‌প্লিমেন্টরি অ্যান্ড অলটারনেটিভ মেডিসিন বলা হয়। হোমিওপ্যাথি এদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়। স্মৃতির অতলে তলিয়ে না গেলে আমাদের মনে পড়া উচিত করোনা মহামারীর একেবারে প্রাক্কালে টিভি চ্যানেল ও সংবাদপত্র জুড়ে 'করোনা চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথির অত্যাশ্চর্য কার্যকারিতার' কথা। কখনো আর্সেনিকাম এলবাম খেলে করোনা প্রতিরোধ হয়ে যাচ্ছে, কখনো আগ্রার নৈমিনাথ হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজে হোমিওপ্যাথির 'সফল' ট্রায়াল হচ্ছে (জি চব্বিশ ঘন্টার ''অফবিট''-এ সম্প্রচারিত হয়েছিল ১লা মে) আবার কখনও ভুপাল হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজে ৬ জন করোনা রুগীকে কেবলমাত্র হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় সারিয়ে তোলার দাবি করা হচ্ছে, যা পরে সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়ে নেয় ওই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ (দ্য হিন্দু, ২৭মে ২০২০)। করোনা মহামারীর ভারতে প্রকোপ শুরুর প্রায় ৭ মাস পর আজকের দিনে দাঁড়িয়ে করোনা প্রতিরোধ বা চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথি আদৌ কতটা কার্যকর তা যে কোনো যুক্তিশীল তথা বিচক্ষণ

ব্যক্তির কাছে দিনের আলোর মতই পরিষ্কার হয়ে গেছে।

এরপরেও অবসর থেকে যায় যেখানে হোমিওপ্যাথি বিজ্ঞান কিনা, তা কার্যকর কিনা — তা নিয়ে তর্ক বিতর্ক চলতেই থাকে। অনেকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই হোমিওপ্যাথির কার্যকারিতা নিয়ে অত্যন্ত আশাবাদী। সেই কারণেই সরাসরিভাবে এককথায় 'হোমিওপ্যাথি একটি বুজরুকি' বলে ঘোষণা না করে আমরা হোমিওপ্যাথির একাধিক আঙ্গিককে বুঝতে চেয়েছি ও সেই মতো করেই পাঠকের সামনে তা মেলে ধরতে চেয়েছি। এই সংকলনের লেখাগুলি যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই একজন চিকিৎসকের দৃষ্টিতে মানুষের রোগভোগকে দেখেছেন ও বুঝেছেন, আর তাই হোমিওপ্যাথি সংক্রান্ত তাদের মতামতকে আমাদের গুরুত্ব দিতেই হয়েছে। অন্যদিকে আমরা চেষ্টা করেছি যাঁরা চিকিৎসক নন, অথচ আধুনিক বিজ্ঞানচর্চায় নিমগ্ন তাঁদের লেখাও রাখতে, যাতে হোমিওপ্যাথির সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের সম্পর্কটা তাঁরা আমাদের দেখিয়ে দিতে পারেন। এই সংখ্যায় বিশিষ্ট আবহাওয়া বিজ্ঞানী শ্রী অঞ্জন কুমার সেনশর্মা মহাশয় কর্তৃক রচিত হোমিওপ্যাথির ওপর সে আস্থা রাখা যায়, তা যে নিছক বুজরুকি নয় — তা নানা তথ্য দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। কয়েকজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসককেও একাধিকবার অনুরোধ করা হয়েছিল হোমিওপ্যাথির পক্ষে কিছু লেখা দিতে, যাতে তাঁরা হোমিওপ্যাথির বৈজ্ঞানিক ও কার্যকারিতার দিকগুলো তুলে ধরতে পারেন, কিন্তু তাঁদের থেকে সেই প্রত্যুত্তর পাওয়া যায়নি। আশা করি এই বিশেষ সংখ্যাটি পড়ে একাধিক হোমিওপ্যাথ তথা হোমিওপ্যাথিতে সুস্থ হওয়া ব্যক্তি সেই ধরনের কিছু লেখা চিঠি আকারে দেবেন। উৎস মানুষের সমস্ত পাঠকের কাছে নিবেদন এই সংকলনটির উদ্দেশ্য হোমিওপ্যাথির কোনো চিকিৎসক বা হোমিওপ্যাথি অনুরাগীকে ব্যক্তি আক্রমণ বা ছোট করা নয়। বিশেষ সংখ্যাটি যে হোমিওপ্যাথিকে একেবারে নাকচ করতে চাইছে তা নয়। ঐতিহাসিক, সামাজিক, দার্শনিক ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হোমিওপ্যাথিকে যাচাই করাই এর একমাত্র লক্ষ্য। এই বিশেষ সংখ্যাটি পড়ার পর হোমিওপ্যাথির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও কার্যকারিতা নিয়ে পাঠকদের একটি পূর্ণাঙ্গ এবং সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হলেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক।

পরিশেষে বলি, উৎস মানুষের মতো একটি চল্লিশ বছরের পুরানো ঐতিহ্যবাহী সামাজিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে হোমিওপ্যাথির মতো বিতর্কিত একটি বিষয়ে এমন একটি সংখ্যায় কাজ করতে পেরে আমি অভিভূত। পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যার অতিথি সম্পাদক করে আমাকে যে সম্মান দেখানো হল তার জন্য উৎস মানুষ পরিবারের সকল সদস্যদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

# বিশেষ সংখ্যা : কিছু কথা

গত মার্চের গোড়া থেকেই যে চিন্তা বা বলা ভাল দুশ্চিন্তা সমগ্র মনুষ্য সমাজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তা কোভিড-১৯ ভাইরাস, যা প্রতিনিয়ত আমাদের ধৈর্য আর সংযমের পরীক্ষা নিয়ে চলেছে। এই সম্পূর্ণ অজানা ভাইরাসজনিত অতিমারীর বিপর্যয় থেকে আমরা কবে যে রেহাই পাব তা অনিশ্চিত!

প্রিয় পাঠকবন্ধুরা জানেন গত জানুয়ারিতে উৎস মানুষ পত্রিকা চল্লিশ বছর পূর্ণ করেছে। এই উপলক্ষে আমরা কয়েকজন পুরনো বন্ধুকে পত্রিকা নিয়ে তাদের স্মৃতিচারণ করার অনুরোধ করেছিলাম। আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে শ্রদ্ধেয় বন্ধু স্বপ্নময় চক্রবর্তী, রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য, নিরঞ্জন বিশ্বাস এবং সতীশচন্দ্র মণ্ডল তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা পাঠকের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। আমরা কৃতজ্ঞ।

এবছরেই উৎস মানুষের অভিভাবক স্থানীয় শ্রদ্ধেয় অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুজয় বসুকে আমরা হারিয়েছি। প্রয়াত হয়েছেন শ্রদ্ধেয় তুষার কাঞ্জিলাল। এঁরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন সময়ে উৎস মানুষ আয়োজিত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতার বক্তা ছিলেন। তাঁদের অভিজ্ঞতা প্রতিনিয়ত আমাদের নতুন নতুন ভাবনার খোরাক জুগিয়েছে। আমরা দুখিঃত, অতিমারীর জন্য একাদশবর্ষ স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা গেল না।

চল্লিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে কোনও একটা বিষয়ের ওপর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হবে বলে ঠিক হয়েছিল। সে সুযোগ এসে গেল আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধু ডা. অর্ক বৈরাগ্য-র সৌজন্যে। বেশ কিছুদিন ধরে অর্ক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ও তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কতটা তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিল। সোশ্যাল মিডিয়াতে দু-একটি লেখাও পোস্ট করেছিল। আমাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে অর্ক উৎস মানুষকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। এই বিশেষ সংখ্যায় সে নিজে লিখেছে ও বেশিরভাগ লেখা জোগাড় করে দিয়েছে, সেই সঙ্গে সম্পাদনার কাজটিও দক্ষতার সঙ্গে করে দিয়েছে। অতিথি সম্পাদক হিসেবে অর্ককে পেয়েছি। এটুকু সম্মান তাঁর প্রাপ্য।

হোমিওপ্যাথি নিয়ে আলোচনা, তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ আমরা লক্ষ্য করেছি হোমিওপ্যাথির সামাজিক প্রভাব উপেক্ষা করার মতো নয়। একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাই যুক্তিহীন বিশ্বাসের ফাঁদ থেকে তাকে বের করে আনতে পারে। ৮০-র দশকের অন্যতম বিজ্ঞান পত্রিকা 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' ১৯৮৪-তে 'হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান' পুস্তিকাটি প্রকাশ করে। তাদের সম্মতিক্রমে উৎস মানুষ বইটির দুটি সংস্করণ প্রকাশ করে। শেষ পরিমার্জিত সংস্করণ বেরোয় ২০০৩ ফেব্রুয়ারিতে। বইটি খুব দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়। সেই সংস্করণে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর পক্ষ থেকে অনুমতিপত্রে লেখা হয়েছিল — 'উত্তর আধুনিকতার লক্ষণাক্রান্ত এই সময়ে বিভিন্ন জীবনযাপন পদ্ধতির প্রতি সহনশীলতা বেড়েছে। হোমিওপ্যাথিরও নতুনত্বে উত্তরণ হয়তো সময়ের অপেক্ষা। বিজ্ঞানেও তো সীমানা ভেঙে তছনছ। কাজেই বিদ্বেষহীন বিচার চলুক।' আমরা মনে করি সেই ধারা চালু রাখাটা খুব জরুরি। আশা করি বিশেষ সংখ্যার লেখাগুলি পাঠকের মনে কিছু প্রশ্ন তুলবে, কিছু বিতর্ক দানা বাঁধবে যা প্রচলিত ধারণাকে ফুঁ মেরে উড়িয়ে না দিয়ে এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হোমিওপ্যাথিকে দেখার চোখ খুলে দেবে।

হোমিওপ্যাথি নিয়ে প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক অমলকুমার রায়চৌধুরী তাঁর ''আত্মজিজ্ঞাসা ও অন্যান্য রচনা''-তে লিখছেন (পৃ.৪১) 'হোমিওপ্যাথি যতদূর জানি ঠিক বিজ্ঞানের অনুবর্তী নয়। কোন বস্তুর তুলনামূলক পরিমাণ কমিয়ে আনলে, তার ক্রিয়াশীলতা বাড়ে বলে হোমিওপ্যাথির যে দাবি, বিজ্ঞান তা সমর্থন করে না। এ হিসেবে হোমিওপ্যাথি ও জ্যোতিষের অবস্থান অনেকটা একরকম। সম্প্রতি কোনও কোনও মহল থেকে চেষ্টা হয়েছিল জ্যোতিষকে একটি বিজ্ঞানের বিভাগ বলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রতিষ্ঠা করা। আমার মতে তার বিরুদ্ধে সেরকম কোনও আপত্তি দেখি না এবং সরকারও এর পঠনপাঠন ও প্রচলনে সহায়ক। অবশ্য বহু লোকের মুখে শুনেছি যে বৈজ্ঞানিক বিচারে যাই বলুক, তাঁরা হোমিওপ্যাথির ঔষধ খেয়ে উপকার পেয়েছেন, পুরোনো রোগের হাত থেকে মুক্ত হয়েছেন, কিন্তু তেমনি তো অনেকেই আবার বলেন যে জ্যোতিষীর পরামর্শ মত পাথর ইত্যাদি ধারণ করে তাঁরা রোগমুক্ত হয়েছেন, এমনকি জীবনের নানারকম বিপত্তির নিরসন হয়েছে।'

বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণের আগে ও পরে দুই দশক তথা ২০ বছরের যে দীর্ঘ পরিসর, উৎস মানুষ প্রকাশনার ক্ষেত্রে তা এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। প্রথম দুই দশকে (জানুয়ারি ১৯৮০-জানুয়ারি ২০০০) পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছিল। কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা যেমন 'জ্যোতিষ' ও 'বন্যা' পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। প্রকাশিত হয়েছিল বিজ্ঞান ও সমাজ বিষয়ক নাটক এবং ধারাবাহিক রচনা। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অশোক রুদ্রের ধারাবাহিক লেখাগুলো নিয়ে সংকলন *শেকল ভাঙা সংস্কৃতি*। এছাড়া *সাপ নিয়ে কিংবদন্তি*, *বিবেকানন্দ অন্য চোখে*, *খাবার নিয়ে ভাবার আছে*, *প্রমিথিউসের পথে*, *চেনা বিষয় অচেনা জগৎ*, *এটা কী ওটা কেন*, *নিজের মুখোমুখি*, দার্শনিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *প্রতিরোধ* ও তাঁরই লেখা *যে গল্পের শেষ নেই* বইগুলো বছরের পর বছর পাঠকের চাহিদা মিটিয়েছে। বহু মানুষের আন্তরিক সহযোগিতায়, বেশ কিছু বিজ্ঞান সংগঠনের সাহায্যেই সম্ভব হয়েছিল এই বিস্তৃত কর্মকাণ্ড ও দীর্ঘ পথচলা। উৎস মানুষের প্রকাশনা ও সম্পাদনা, বাৎসরিক আড্ডা, গণবিজ্ঞান আন্দোলনের অভিমুখ ঠিক করা ও নানা গঠনমূলক অনুষ্ঠানে যোগদান সবকিছুই আবর্তিত হত একজন মানুষকে কেন্দ্র করে। তিনি অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। ওঁর তীক্ষ্ণ মেধা ও বাচিক গুণে সহজেই ছোটোবড়ো সবাই আকৃষ্ট হত। '৮০-র দশকের মাঝামাঝি গণবিজ্ঞান আন্দোলনে উৎস মানুষ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে, তার রেশ বেশ কিছুদিন ধরে চলেছিল। '৯০ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে পরিশ্রম ও শারীরিক অবহেলার কারণে অশোক মাঝেমাঝে অসুস্থ হয়ে পড়ত। পরের দুই দশকের অর্থাৎ ২০০০-এর জানুয়ারি মাস থেকে কতিপয় সঙ্গীকে নিয়ে অশোক পত্রিকার কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। তখন পত্রিকা দ্বিমাসিক, বছরে ৬টি সংখ্যা বেরোত। এই সময়ে ২০০০ও২০০১-এ দুটি বিশেষ 'বন্যা' সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ২০০২-এর জুলাই থেকে পত্রিকা ত্রৈমাসিক হয়ে যায়। ২০০৩-এ উৎস মানুষ পত্রিকা নানান সমস্যায় পড়ে,যার অন্যতম হল সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতা। সে বছর (২০০৩) প্রথম

সংখ্যাটি বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকা প্রকাশের সাময়িক বিরতি ঘোষণা করা হয়।

২০০৩-এর জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন—''...এবার বিরতি নিতে হবে, দীর্ঘ তেইশ বছর পরে। পত্রিকা প্রকাশনার ক্রমশ পুঞ্জীভূত সংকট এখন প্রবল। নিরসনের কোনো উপায় আর নেই। পত্রিকার কোনো ঘর এখন নেই, দেখাসাক্ষাৎ বিক্রিবাটার জায়গা নেই, চাহিদামাফিক বইপত্র কাছের-দূরের পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বন্দোবস্ত নেই, আর্থিক সচ্ছলতা নেই এবং সবচেয়ে বড় কথা কোনো দায়িত্বশীল তরুণ স্বেচ্ছাব্রতী কর্মীর দেখা নেই...। এতকিছু 'নেই' নিয়ে উৎস মানুষ এখন ক্লান্ত, ভারাক্রান্ত। বহু মানুষের শুভেচ্ছা সদিচ্ছা রয়েছে জানি, তার দামও অনেক আমরা জানি, কিন্তু তা দিয়ে যে প্রকাশনার পরিকাঠামো গড়া যায় না। অতএব, আপাতত, বিষণ্ণ বিরতি। হয়তো বা সাময়িক। আবার চলা শুরু হবে, সময় সহজ হলে পরে।''

২০০৪ ও ২০০৫ ত্রৈমাসিক পত্রিকা নিয়মিত না বেরোলেও কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা ও পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। যেমন — *আমাদের শান্তিনিকেতন, আয়ুর্বেদে বিজ্ঞান, যৌনদাসী সংখ্যা*। পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে না এটা অশোক মেনে নিতে পারছিলেন না। কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে অশোক উৎস মানুষের নেট সংস্করণ চালু করে এবং সেই সঙ্গে উৎস মানুষ ওয়েবসাইট। ১৭ নভেম্বর, ২০০৮, অশোক প্রয়াত হন, তাঁর সন্তানসম উৎস মানুষ নিয়ে স্বপ্নবিভোর চিন্তাভাবনার ওপর যেন আকাশ ভেঙে পড়ে! অশোকের প্রয়াণের সাথে সাথেই গণবিজ্ঞান আন্দোলনের একটি যুগের অবসান ঘটল। অশোক ও উৎস মানুষ একই সুরে 'দুটি তারে ... বাঁধা ছিল'। ওঁর অকাল প্রয়াণে সেই মূল সুরটাই যেন কেটে গেল। ওই ধাক্কা সামলে অশোকের দেখানো পথে পত্রিকা আবার চলতে শুরু করল। সম্প্রতি বাংলাদেশের জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা 'নবীন বিজ্ঞানী' সেপ্টেম্বর ২০১৯ সংখ্যায় বিজ্ঞান আন্দোলনে তিনজন প্রাতঃস্মরণীয় বিজ্ঞানীর সম্পর্কে যা লিখেছে তার খানিকটা অংশ তুলে দেওয়া হল— ''...এই প্রবন্ধে যে তিনজন বিজ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের কথা বলতে যাচ্ছি তাঁরা সেই হাতে গোনা মানুষদের দলভুক্ত, যাঁরা এই দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে গেছেন। এই তিনজনের মধ্যে দুজন বাংলাদেশি ও আরেকজন বাংলাদেশি না হলেও বাঙালি। ...বর্তমান সময়ে অনেকের কাছে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় নামটি তেমন একটা পরিচিত নয়। কিন্তু নববই দশকের মাঝামাঝি সময়ে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত উৎস মানুষ প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের কিছু বিজ্ঞানকর্মীকে আলোকিত করেছিল তাদের কিছু প্রকাশনার মাধ্যমে। আর পাশের পশ্চিমবঙ্গে ৮০-৯০-এর দশকে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে উৎসমানুষ পত্রিকাটি হয়ে উঠেছিল বিজ্ঞান আন্দোলনের ধারক-বাহক। ...সামগ্রিকভাবে তাঁর কর্মের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন আত্মপ্রচারবিমুখ এই মানুষটি। বহু সংগঠন ও সামাজিক নানা কাজকর্মে যুক্ত মানুষজন 'উৎস মানুষ' থেকে নিয়েছেন কাজের প্রেরণা। উৎসমানুষের ভাবনায় উজ্জীবিত হয়ে অনেকে গড়ে তোলেন বিজ্ঞান সংগঠন।'' (পুরো লেখাটি উৎসমানুষের ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে)।

গণবিজ্ঞান আন্দোলনের চেহারাটা কেমন ছিল, তা বুঝতে গেলে আমাদের একটু অতীতে ফিরে তাকাতে হবে। বিগত শতাব্দীর বিজ্ঞানকর্মী ও বিভিন্ন সংগঠকদের কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণ ও আলোচনা নিষ্ঠার সাথে করেছেন সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, যা উৎসমানুষের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০০০ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। শিরোনাম ছিল—'বিজ্ঞান ক্লাব বিজ্ঞান চেতনা বিজ্ঞান-ইতিহাস ও তথ্যনিষ্ঠ পর্যালোচনা', সত্যিই উল্লেখযোগ্য তথ্যনিষ্ঠ আলোচনার এক নির্ভরযোগ্য দলিল, যা ভবিষ্যতের বিজ্ঞানকর্মীদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানের প্রেক্ষিতে বিষয়টির আবারও মূল্যায়ন হওয়া জরুরি।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াণের পর একটি স্মরণ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। মূলত অশোকের সাথে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন তাঁদের লেখা দিয়ে। এরপরে ২০০৯-এ বইমেলায় উৎস মানুষের স্টলে ঠিক হয় যে, উৎসমানুষ পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করার চেষ্টা করা হবে, সেইমতো জানুয়ারি ২০০৯ থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে চলেছে নিয়মিত। ২০০৯ থেকে প্রকাশিত সংখ্যাগুলি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। পাঠক

ও গবেষকদের অনুরোধকে মান্যতা দিয়ে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি যাতে ১৯৮০-র জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত সমস্ত সংখ্যাগুলিকে ডিজিটাইজ করে ওয়েবসাইটে তুলে দেওয়া যায়। বিগত দশকে বেশ কিছু নতুন বই প্রকাশ করা হয়েছে যেমন — *লেখালিখি, গুমোট ভাঙার গান, বাঁধ বন্যা বিপর্যয়, মূল্যবোধ, যুক্তিবাদের চার সেনাপতি* ইত্যাদি। উল্লেখ্য অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা লেখাগুলিকে একসাথে করে সংকলিত করা হয়েছে 'লেখালিখি' বইটিতে।

কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলাতে উৎস মানুষের স্টলে পাঠক ও লেখকদের উপস্থিতি এখন একটি বিশেষ মাত্রা পেয়েছে, সেই সঙ্গে বেড়েছে উৎস মানুষ প্রকাশনার বই ও পত্রিকার বিক্রি। আমরা আশাবাদী উত্তরোত্তর এই ধারা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু বর্তমান করোনা অতিমারীর কারণে ২০২১-এর বইমেলা অনিশ্চিত, সুতরাং এখনই বলা যাচ্ছে না ভবিষ্যতে কি হবে। আমরা অনুরোধ করব উৎস মানুষ-এর ওয়েবসাইট (www.utsomanush.com)-এ চোখ রাখুন। এ বছরের ২য় ও ৩য় সংখ্যা ছাপা হয়েছে খুবই সীমিত সংখ্যায়, গ্রাহকদের কাছে ডাকযোগে পাঠানো হয়েছে। আমরা প্রায়শই পাঠক ও বিজ্ঞানকর্মীদের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে থাকি যার মূল বক্তব্য হল--- কেন উৎস মানুষের পরিচালকেরা প্রতিবেদনধর্মী লেখা, সমাজবিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে নাটক ইত্যাদি লেখা ছাপছেন না। তদুপরি আড্ডার আয়োজন করা হচ্ছে না কেন? উত্তরে বলি, ৩/৪জন সিনিয়র সিটিজেন কোনোমতে উল্লিখিত কাজকর্মগুলি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এর বেশি কিছু করা বোধহয় সম্ভব নয়। অনুরোধ লেখা পাঠান, লেখার মান ও প্রাসঙ্গিকতা বিচার্য। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতায় উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করুন এবং নতুন প্রজন্মের বিজ্ঞানকর্মীদের উৎসাহ দিন। নতুন প্রজন্ম এগিয়ে না এলে আর পাঁচটা পত্রিকার মতো উৎস মানুষও বন্ধ হয়ে যাবে। নতুবা সেই সামাজিক পরিমণ্ডল ও অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মানুষদের নেতৃত্বের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আমাদের কাজ প্রদীপের শিখাকে প্রজ্জ্বলিত রাখা নতুন আলো-বর্ণচ্ছটার প্রত্যাশায়, যা উৎস মানুষের পঞ্চাশ বছর পূর্তিকে স্বাগত জানাবে।

**পরিচালকমণ্ডলী**

উমা

# উৎস মানুষের চল্লিশ বছর

১৯৮১-র জানুয়ারি। শ্রদ্ধেয় নিরঞ্জন বিশ্বাস আমার হাতে তুলে দেন উৎস মানুষ। ইতিপূর্বে দু-একখানা বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা একটু-আধটু পড়েছিলাম, কিন্তু মনের খোরাক মেটেনি। কিন্তু উৎস মানুষ পড়ে এতটাই ভালো লাগল যে পরের মাস থেকেই গ্রাহক হয়ে গেলাম। আমার মতো বেশ ক'জন উৎস মানুষের গ্রাহক হলেন। প্রতি মাসে নিরঞ্জনবাবুর কাছ থেকে পত্রিকা নিতাম। পত্রিকার পাতা উল্টে বুঝলাম পত্রিকাটি সমাজের প্রচলিত অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কারের ঘেরাটোপ থেকে বের করে মানুষকে বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিবাদের পথের সন্ধান দেওয়ার মস্ত হাতিয়ার। এভাবেই একদিন উৎস মানুষের বৃহত্তর পরিবারভুক্ত হয়ে গেলাম। গঠিত হল 'উৎস মানুষ পাঠচক্র'- হরিণঘাটায়। প্রতিমাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় হরিণঘাটার উত্তর বাজারে 'হেলেনা হোমিও সদনে' পাঠচক্রের সদস্যরা মিলিত হতাম। উৎস মানুষ থেকে কোনো একটি বিষয় বেছে নিয়ে তা নিয়ে আলোচনা, মতামত বিনিময় হত। লেখার কোনও অংশ বুঝতে অসুবিধে হলে অশোকবাবুকে (উৎস মানুষ সম্পাদক প্রয়াত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়) চিঠি পাঠাতাম। এরকমই একবার চিঠির উত্তরে অশোকবাবু লিখলেন— আপনারা এমন সব বিষয় খুঁজে বের করেন যে সঠিক উত্তর দিতে আমাকে পড়াশোনা করতে হয়। চিঠিটি পাঠচক্রে পড়া হলে সবাই বেশ উৎসাহিত হতেন। এরপর পাঠচক্রের সদস্যরা মিলে মাঠে নেমে পড়লাম। অর্থাৎ পথে-ঘাটে, বাজারে যেখানেই জনসমাগম বেশি সেসব জায়গা বেছে নিয়ে পাঠচক্রের প্রচার শুরু হল, হাতিয়ার উৎস মানুষ। সদস্যরা সিদ্ধান্ত নিলেন 'হাঁচি-টিকটিকি-বাধা যে মানে সে গাধা', ন্যাবার মালা বাড়ে রোগ সারে, মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, তাবিজ-কবচ, গুরুবাবাদের বুজরুকি, ২১ দিনের বকনা বাছুরের দুধ দেওয়া, জ্যোতিষীদের ভাঁওতা — এরকম সব বিষয়গুলি যেগুলিতে মানুষের বিশ্বাসের শিকড়-বাকড় গজিয়েছে সেসব সমাজ থেকে সমূলে উৎপাটন না করতে পারলে বিজ্ঞানমনস্কতা পিছু হটবে, সেইসঙ্গে সমাজের বৃহত্তর অংশ অন্ধকারে পথ হাতড়াবে। পাঠচক্রের উদ্যোগে গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব শুরু হয়। হরিণঘাটার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে এই অভিনব উৎসব ছড়িয়ে পড়ে। নারায়ণপুর, সুকান্ত পল্লী, সুবর্ণপুর, হরিণঘাটা কলেজ পাড়া, ভাতশালা, সিমহাট, মেঠোপাড়া ও বড়জাগুলি এলাকার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সেই

উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। দু-তিনটি এলাকা বাদে অন্য এলাকাগুলিতে এই ক্রীড়া উৎসব একইভাবে চলছে। মনে পড়ে ১৯৮৬-তে হ্যালির ধূমকেতু দেখার আয়োজনে কলকাতার স্কাই ওয়াচার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতার কথা আর মাননীয় আশীষ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় আকাশ পর্যবেক্ষণের কথা। পাঠচক্রের আহ্বানে ১৯৮৭-তে 'অন্ধবিশ্বাস-কুসংস্কারবিরোধী কমিটি' গঠিত হয়। কমিটির সদস্যরা মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তুলতে এলাকাভিত্তিক নানান অনুষ্ঠান শুরু করেন। সাপে কাটা, কুকুরের কামড়ের যথার্থ চিকিৎসা, পানীয় জলের নমুনা সংগ্রহ করে তাতে আর্সেনিকের মাত্রা মাপা, ওঝা-গুণিনদের কেরামতি ফাঁস করা, আন্ত্রিক ও ডায়ারিয়া নিয়ে সতর্কতামূলক প্রচার, বিয়েতে পণপ্রথাবিরোধী প্রচার কর্মসূচি চলতে থাকে। ১৯৯৬-তে হরিণঘাটা কলেজে 'উৎস মানুষ আড্ডা'-র আয়োজন করা হয়। প্রচলিত শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান করে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান না করে প্রয়াত মানুষটির স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান করার যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনা পাঠচক্রের কর্মসূচির ভেতর ঢুকে পড়ে। ১৯৮৩ থেকে ২০২০ পর্যন্ত এরকম স্মৃতিচারণার ঘটনা প্রায় ৫৪টি। ডা. সুশীল রায়ের বাবা জগদীশচন্দ্র রায়ের স্মৃতিসভায় উৎস মানুষ সম্পাদক প্রয়াত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণীয় উক্তি 'ভূপাল দুর্ঘটনায় হাজার হাজার মানুষের প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করা সহজ। কিন্তু আজকের স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে মাসীমা (প্রয়াতের স্ত্রী) মেসোমশাইয়ের প্রতিকৃতিতে প্রথম যে মালাটি দিয়ে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন এই কাজটি তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন।'

শেষে বলি, উৎস মানুষ ও অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় 'উৎস মানুষ পাঠচক্রের' সদস্যদের কাছে একার্থবোধক। আমাদের মধ্যে তিনি নেই ভাবতেও পারি না। ভাবিও না। পত্রিকার ২০২০-র জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে আমার মনের কথা প্রতিফলিত হয়েছে। 'চল্লিশে চালসে নয়, আমরা পূর্ণ উদ্যমেই ছুটতে চাই।...' উৎস মানুষ পত্রিকার সকল কর্মী যাঁরা এই উদ্যোগটিকে এতদিন ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। উৎস মানুষ থেকেই জন্ম নিয়েছে উৎস মানুষ পাঠচক্র যা আমাদের বিজ্ঞানমনস্কতার আলো দেখিয়েছে।

**সতীশচন্দ্র মণ্ডল**
**(হরিণঘাটা উৎস মানুষ পাঠচক্রের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য)**

উমা

# প্রস্তাবনা : বিশেষ হোমিওপ্যাথি সংখ্যা

স্বাস্থ্য নাগরিকের অধিকার। দেশের সমস্ত নাগরিককে বিজ্ঞানসম্মত ও কার্যকরী চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া একটি জনকল্যাণকর ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্তব্য। চিকিৎসা পরিষেবাকে দুর্মূল্য করে রেখে, চিকিৎসা পরিষেবায় প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ব্যয় করে, চিকিৎসা ব্যবস্থায় মানবসম্পদের যথাযথ উন্নয়ন না করে সমস্ত মানুষকে সমান বিজ্ঞানসম্মত ও কার্যকরী চিকিৎসা না দিলে রাষ্ট্র নিজের কর্তব্য পালনে দৃশ্যমানভাবে ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতা থেকে লুকোতে রাষ্ট্র স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বরাদ্দ না বাড়িয়ে বা মানবসম্পদের যথাযথ উন্নয়ন না করে বিভিন্ন শর্টকাট ও চটজলদি সমাধানের চেষ্টা করে, যাতে করে মানুষের ন্যায্য ক্ষোভগুলিকে সাময়িক চাপা দেওয়া যায়। এই চটজলদি সমাধানের একটি পন্থা যদি হয় স্বাস্থ্যবিমার প্রচলন, তবে অন্যটি হল চিকিৎসা পরিষেবার অঙ্গনে বিভিন্ন অপ্রমাণিত, অবৈজ্ঞানিক ও অকার্যকর চিকিৎসাব্যবস্থা তথা শাস্ত্রকে জায়গা করে দেওয়া। দ্বিতীয় উপায়ের সুবিধে হল তাতে জিডিপির ব্যয় করতে হয় অনেক কম, সেগুলিকে প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী তকমা লাগিয়ে মানুষের বিশ্বাস অর্জন করা হয় সহজ এবং সরকারি সিলমোহর লাগিয়ে সেগুলি প্রান্তিক, দরিদ্র আর অনন্যোপায় সাধারণ মানুষকে 'খাইয়ে' তাদের যথাযথ সুলভ চিকিৎসা পরিষেবা না পাওয়ার ক্ষোভগুলিকে চাপা দেওয়া যায় সুচারুভাবে।

হোমিওপ্যাথিকে বর্তমানে ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা ঠিক এই ভাবেই ব্যবহার করছে বলে আমরা মনে করি। বর্তমানে মোট হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজ ও পাশকরা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের সংখ্যার বিচারে ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থানে। অন্যদিকে স্বাস্থ্যখাতে জিডিপির ব্যয় ও নাগরিকের স্বাস্থ্যসূচকে ভারতের স্থান যথাক্রমে ১৪১তম ও ১৪৫তম যা কিনা বাংলাদেশ, ভুটান ও শ্রীলঙ্কার ও পিছনে। (সূত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের ত্রুটিপূর্ণ অগ্রাধিকার (মিসপ্লেসড প্রায়োরিটি) আমাদের স্তম্ভিত তথা বিচলিত করেছে। এই অব্যবস্থার

প্রতিকার চাইতে হোমিওপ্যাথির পিছনে না পরে বা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকদের সমালোচনা না করে যেমন রাষ্ট্রের কাছে কৈফিয়ত চাইতে যাওয়া দরকার তেমনই এই আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির মারাত্মক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মানুষকে জানানো তথা সচেতন করাও দরকার এবং একজন চিকিৎসক হিসেবে সেটি আমাদেরই দায় বলে মনে হয়েছে। এই লেখালেখি সেই জায়গা থেকেই।

আমরা জানি আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার (চিকিৎসা বিজ্ঞানের নয়) একাধিক জনবিমুখ কারণে, ভারতের প্রত্যন্ত এলাকায় অত্যন্ত নিম্নমানের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর কারণে, বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে এবং সর্বোপরি বিজ্ঞান চেতনা ও যুক্তিশীলতার অনভ্যাসের কারণে আধুনিক চিকিৎসা সমস্ত মানুষের কাছে সমানভাবে পৌঁছাতে পারেনি বা গৃহীত হতে পারেনি। সেই জায়গা থেকে এমন বহুমানুষ রয়েছেন যারা হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস করেন ও হোমিও ওষুধ খেয়ে তাঁর বা তাঁর পরিবারের উপকার হয়েছে বলে মনে করেন। আমরা তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে সম্মান করি তথা হোমিওপ্যাথির প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিকেও পরিসর দিই। আমরা দাবি করি না আমরা ব্যক্তিগতভাবে এই বিশ্বের সমস্ত জটিল বিষয় এমনকি চিকিৎসা শাস্ত্রেরও সব কিছু জেনে বুঝে গেছি। কিন্তু আমাদের এই অজ্ঞানতার অন্ধকারেও আমরা বিশ্বাস করি পৃথিবীতে বেশিরভাগ মানুষই আসলে সত্যের প্রতি অনুসন্ধিৎসু, জিজ্ঞাসু আর সঠিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে আগ্রহী। আমরাও তাদেরই সাথে একই পথের পথিক। আর এই অচেনা, অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ চলতে আমাদের কাছে এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে কার্যকরী হাতিয়ার আমাদের বিজ্ঞান। আমরা নিজেদের জীবন থেকে, সভ্যতার ইতিহাস থেকে, জ্ঞানী গুণী মনীষীদের থেকে শিখেছি আধ্যাত্মিক জীবনে সত্যকে জানতে যেমন প্রশ্নহীন বিশ্বাসের ভূমিকা রয়েছে, দৈনন্দিন ও ব্যবহারিক জীবনে নিজের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের প্রশ্নে সত্যকে জানতে বিজ্ঞান, পরীক্ষা-প্রমাণ ও তর্ক বিতর্কের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

সত্যকে জানার সেই তাড়না থেকেই আমরা হোমিওপ্যাথিকে বিজ্ঞান, পরীক্ষা-প্রমাণ ও তর্ক বিতর্কের আলোতে দেখতে চেয়েছি, বিশ্বাসের জায়গা থেকে নয়, কারণ তার সরাসরি প্রভাব আমাদের স্বাস্থ্যের ওপর রয়েছে। আর স্বাস্থ্য সম্পদও বটে।

হোমিওপ্যাথি সংক্রান্ত আমাদের যাবতীয় লেখার এই সংকলনটি হোমিওপ্যাথির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কিনা, ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে তার কার্যকারিতা প্রমাণিত কিনা ও কেন হোমিওপ্যাথিতে কাজ হয় বলে একাধিক মানুষের মনে হয় এই বিষয়গুলির ওপর ঘোরাফেরা করেছে। কোনো ব্যক্তি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক বা হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাসী কোনো মানুষকে ব্যক্তি আক্রমণ করা বা তাদের ছোট করা এই বিশেষ সংখ্যার উদ্দেশ্য নয়। এমন কারোর মনে হয়ে থাকলে আমরা তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

পাঠকের কাছে অনুরোধ সব লেখাগুলি যুক্তি ও তথ্যনিষ্ঠভাবে ধৈর্য ধরে পড়ুন, সব দিক থেকে ভেবে দেখুন আর বিচার করুন। শেষে আমাদের বক্তব্যের সাথে সহমত কিনা বা কোনো বক্তব্যের সাথে ভিন্নমত কিনা সেগুলি আমাদের জানান। হোমিওপ্যাথি শাস্ত্র বা রোগ সারাতে তার কার্যকারিতায় বিশ্বাস করা একটি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত, কিন্তু সেই সিদ্ধান্তটি নেওয়ার আগে হোমিওপ্যাথির সবগুলো দিক, সেই সংক্রান্ত সব রকমের তথ্য-প্রমাণ ও নানাবিধ বৈজ্ঞানিক যুক্তিকাঠামো পাঠকের সামনে তুলে ধরাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এগুলির ওপর ভর করে পাঠকবর্গ হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে একটি অবগত সিদ্ধান্ত (ইনফর্মড ডিসিশন) নিতে পারলেই আমাদের প্রচেষ্টা সফল হবে।

পরিশেষে জানাই যতদিন পারব বিজ্ঞানসম্মত, কার্যকরী এবং সর্বোপরি মানবিক চিকিৎসা পরিষেবার লক্ষ্যে আমরা একে অপরের সাথে ও আপনাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলবো এই প্রতিশ্রুতি আমাদের সকলের।

উমা

'১লা জানুয়ারি কল্পতরু উৎসব। শতাধিক বছর আগে এই দিনটিতেই নাকি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস 'কল্পতরু' হয়েছিলেন — পরম মোক্ষদর্শন হয়েছিল তাঁর। ভক্তজনেরা আজো ভক্তিনিমীলিত চক্ষে সেদিনকে স্মরণ করেন, উৎসব পালন করেন। কিন্তু চোখ মুদ্রিত থাকলে দেখা যায় না কিছুই। সত্যদর্শনের জন্য চোখ খোলা রাখতে হয়, মনকে খুলে দিতে হয় অবাধ ভাবনার জন্য।'

উৎস মানুষ, ১৯৯৪ জানুয়ারি

# মডার্ন মেডিসিন বনাম হোমিওপ্যাথি

## অর্ক বৈরাগ্য

জন্মলগ্ন থেকেই হোমিওপ্যাথি তৎকালীন প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থা থেকে আলাদা। ঐতিহাসিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, প্রায়োগিক — একাধিক মাপকাঠিতে দেখলে এই পার্থক্যগুলি ভালোভাবে ফুটে ওঠে। হোমিওপ্যাথি তথা তার বিপ্রতীপ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা ব্যবস্থা দুই নিয়েই সামগ্রিক বোঝাপড়া তৈরির উদ্দেশ্যে এই দুইয়ের পার্থক্য তুলে ধরা হল। আশা করি সংকলনের শুরুতেই রাখা এই লেখা পাঠককে মাইলস্টোনের মতো পথ প্রদর্শন করবে তথা পাখির চোখের মতো সমগ্র বিষয়টিকে একনজরে দেখতেও সাহায্য করবে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান আর অ্যালোপ্যাথি এক নয়। তাছাড়া হোমিওপ্যাথির পাল্টা চিকিৎসা ব্যবস্থা অ্যালোপ্যাথি নয়। অ্যালোপ্যাথি একটি পুরনো এবং পরিত্যক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা যার চর্চা চিকিৎসা ব্যবস্থায় আধুনিক বিজ্ঞান প্রবেশ করার সাথে সাথেই বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমান সংখ্যায় হোমিওপ্যাথির বিপরীতে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানকেই রাখা হয়েছে, অ্যালোপ্যাথিকে নয়।

| **মডার্ন মেডিসিন এর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য** | **হোমিওপ্যাথির চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য** |
|---|---|
| **আঠারো ও উনিশ শতক** | |
| ১) গ্যালেনিক হাইপোথেসিস। রোগের কারণ হল — শরীরে চার প্রকার রসের ভারসাম্যহীনতা। রক্ত, শ্লেষ্মা, কালো পিত্ত ও হলুদ পিত্ত — এই চার প্রকার রস। এই সময় এই চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বলা হত — প্রচলিত চিকিৎসা। হ্যানিম্যান যার নাম দিয়েছিলেন অ্যালোপ্যাথি। | ১) হ্যানিম্যানের তত্ত্ব। রোগের কারণ হল — ভাইটাল ফোর্সের ভারসাম্যহীনতা। |
| ২) মূলত রোগীর কাছ থেকে রোগের বিবরণ শুনে রোগ নির্ণয় করা হত, সাথে সামান্য কিছু ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা। | ২) রোগীকে শরীর-মন-চিন্তা ভাবনা-মানসিকতা সমস্ত কিছুর সামগ্রিকতায় দেখা হত। মূলত রোগের ইতিহাস শুনে রোগ নির্ণয় করা হত। |
| ৩) রোগীর মৃত্যুর পর অঙ্গের ব্যবচ্ছেদ করে সেই অঙ্গের ওপর রোগের প্রভাব দেখা হত। | ৩) ভাইটালিজমের দর্শন দ্বারা অনুপ্রাণিত, যেখানে মনে করা হয় জীবের মধ্যে একটি অদৃশ্য পরিমাপের অযোগ্য জীবনীশক্তি রয়েছে বলেই সমস্ত জৈবিক ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন হয়। |
| ৪) ওষুধ বলতে একাধিক ভেষজ পদার্থ, ধাতু, ধাতুর যৌগ যেগুলি উচ্চ ঘনত্বে প্রস্তুত করা হত। এদের বলা হত ক্রুড ড্রাগ। | ৪) ওই একই পদার্থকে অতি মাত্রায় লঘু করে, জলে বা অ্যালকোহলে ঝাঁকিয়ে তার শক্তি বাড়ানো হত। |
| ৫) চিকিৎসা বলতে শিরা কেটে রক্ত বের করে দেওয়া, পায়খানা হবার ওষুধ দেওয়া, বমি হবার ওষুধ দেওয়া, বেশি প্রস্রাব হবার ওষুধ দেওয়া। যাতে করে ঐ চারটি রসের মধ্যে ভারসাম্য আসে। মানসিক রোগের ক্ষেত্রে আলাদা করে রাখা ও বেঁধে রাখা হত। | ৫) চিকিৎসা বলতে ছিল রোগীকে অনেক বেশি সময় দিয়ে তাঁকে সার্বিকভাবে বোঝার চেষ্টা করা, তাঁকে অন্য ব্যক্তির থেকে স্বতন্ত্রভাবে দেখে একটি নির্দিষ্ট ওষুধ নির্দিষ্ট লঘু মাত্রায় দেওয়া। |
| ৬) মেকানিজম এর দর্শন দ্বারা অনুপ্রাণিত, যেখানে মনে করা হয় জীবের জৈবিক ক্রিয়াকলাপগুলি একটি মেশিনের বিভিন্ন অংশের মত করেই সম্পন্ন হয়। | ৬) ভাইটালিজমের দর্শন দ্বারা অনুপ্রাণিত, যেখানে মনে করা হয় জীবের মধ্যে একটি অদৃশ্য, পরিমাপের অযোগ্য জীবনীশক্তি রয়েছে বলেই সমস্ত জৈবিক ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন হয়। |

| | |
|---|---|
| ৭) র‍্যাশনালিজমের দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে মনে করা হয় নির্দিষ্ট কিছু যুক্তি কাঠামো মেনেই সত্যে পৌঁছানো সম্ভব। ইন্দ্রিয় অনুভূতি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভ্রান্ত হয়। | ৭) এম্পিরিসিজমের দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে মনে করা হয় শরীরের রোগ ও তার লক্ষণ সমূহ তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পর্যবেক্ষণ দিয়েই সঠিক ভাবে বোঝা সম্ভব। |
| ৮) ডিডাক্টিভ বা অবরোহী যুক্তিকাঠামো মেনে চলে। | ৮) ইনডাক্টিভ বা আরোহী যুক্তিকাঠামো মেনে চলে। |
| ৯) অ্যানেস্থেশিয়া ও অ্যান্টি সেপসিস আবিষ্কার না হওয়ায় সেগুলি ছাড়াই অত্যন্ত নির্মমভাবে সার্জারি করা হত। | ৯) এই ধরণের চিকিৎসা হোমিওপ্যাথিতে এড়িয়ে চলা হত। |

বিশ ও একুশ শতক

↓

আধুনিক বিজ্ঞানের উত্থান

↓

আধুনিক বিজ্ঞানের নিরিখে দুই চিকিৎসা শাস্ত্রের যাচাই

↓

আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলির সাথে প্রচলিত বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলির সামঞ্জস্যতা প্রমাণ এবং একইসাথে হোমিওপ্যাথির তত্ত্বের ব্যর্থ হওয়া। ভাইটালিজমের ধারণা আধুনিক জীববিদ্যার মাপকাঠিতে ভুল প্রমাণিত হওয়া।

বিশ ও একুশ শতক

| **মডার্ন মেডিসিন এর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য** | **হোমিওপ্যাথির চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য** |
|---|---|
| ১) রোগের কারণ আলাদা আলাদা তন্ত্রের কোষ-কলার মধ্যে উদ্ভুত পরিবর্তন। | ১) রোগের কারণ ভাইটাল ফোর্সের ভারসাম্যহীনতা। |
| ২) সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে রোগের কারণ রোগের জীবাণু যথা ভাইরাস, ব্যাক্টিরিয়া, ছত্রাক, পরজীবী ইত্যাদি। | ২) ব্যাকটিরিয়া রোগের কারণ নয়, রোগের ফলাফল। রোগের কারণ ভাইটাল ফোর্সের ভারসাম্যহীনতা। |
| ৩) সমস্ত রোগ লক্ষণ আসলে শরীরের গঠনগত ও কার্যগত একক— কোষের ত্রুটির মধ্যে নিহিত। | ৩) রোগ-লক্ষণ আসলে শরীরের তিনটি কাল্পনিক স্তরের পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্যে নিহিত। তল তিনটি হল- মানসিক তল, আবেগের তল, শারীরিক তল। |
| ৪) মানবদেহের জিন ও দেহের চারপাশের পরিবেশের মধ্যেকার আন্তক্রিয়া রোগের সৃষ্টি আর তার ভবিষ্যৎ গতিপথকে নির্ধারণ করে। | ৪) বস্তুগত শরীরের একদম কেন্দ্রে অবস্থিত অশরীরী ভাইটাল ফোর্স রোগের সৃষ্টি আর তার ভবিষ্যৎ গতিপথকে নির্ধারণ করে। |
| ৫) ক্রনিক রোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রিস্ক ফ্যাক্টর, জীবনশৈলী ও জিনের গঠন প্রধান ভূমিকা পালন করে। | ৫) হ্যানিম্যান বর্ণিত ও অ্যালেন কর্তৃক সংশোধিত সোরা, সিউডো-সোরা ও সাইকোসিস (মায়াজম তত্ত্ব) এর কারণে ক্রনিক রোগ হয়। |
| ৬) মানবদেহ আলাদা আলাদা তন্ত্রের সমন্বয়ে তৈরী। একটি রোগকে একটি নির্দিষ্ট তন্ত্রের গোলযোগের ফল হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায়। যদিও তন্ত্রগুলি একে অপরকে বিভিন্ন উপায়ে প্রভাবিত করে থাকে। | ৬) মানবদেহে আলাদা তন্ত্রের সমন্বয়ে তৈরি হলেও সেটি অধ্যয়ন করে রোগ নির্ণয় করা যায় না। সামগ্রিক এবং স্বতন্ত্রভাবে ওই ব্যক্তিটিকে দেখতে হবে। |
| ৭) একাধিক ব্যক্তি একই রোগের লক্ষণ ও একই রোগের কারণ নিয়ে এলে তাদের সবার ডায়াগনোসিস ও চিকিৎসা একই হবে। ওষুধের ডোজের তফাৎ হতে পারে তার ওজনের তারতম্যে। | ৭) একাধিক ব্যক্তি একই রোগের লক্ষণ ও একই রোগের কারণ নিয়ে এলেও তাদের ডায়াগনোসিস ও চিকিৎসা আলাদা হতে পারে। কারণ ব্যক্তিবিশেষে রোগের প্রতি সংবেদনশীলতা আলাদা হয়। |
| ৮) চিকিৎসক ওষুধ প্রেসক্রাইব করেন, কিন্তু নিজের হাতে | ৮) ওষুধের কাঁচামাল কারখানায় তৈরি হলেও এমনকি |

| | |
|---|---|
| বানিয়ে দেন না। ওষুধ কারখানায় তৈরি হয়। | ডাইলিউশনও কারখানায় করা হলেও শেষ ধাপে চিকিৎসকই নির্দিষ্ট ওষুধ নির্দিষ্ট ডোজে বানিয়ে দেন। |
| ৯) যে কোনো মডার্ন মেডিসিনের ওষুধ বাজারজাত করার আগে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা ও একাধিক ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের মধ্যে দিয়ে যায়। সেগুলিতে উত্তীর্ণ হলে তবেই সেটি জনগোষ্ঠীতে ব্যবহারের ছাড়পত্র পায়। শুধু তাই নয়, ওষুধ বাজারে আসার পরেও চলে নজরদারি। তখনো যদি কোনো ক্ষতিকর সাইড এফেক্ট ধরা পড়ে তবে ওষুধটি বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়। | ৯) ড্রাগ প্রুভিং এর মাধ্যমে হোমিওপ্যাথিতে ট্রায়াল করা হয়। মডার্ন মেডিসিনের মত করে কোনো ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হয়না। আজ অব্ধি কোনো হোমিওপ্যাথি ওষুধ তুলে নেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়নি, অথচ পৃথিবীজুড়ে লক্ষাধিক মানুষ হোমিওপ্যাথি খেয়ে থাকেন। |
| ১০) মডার্ন মেডিসিনের ওষুধে সাইড এফেক্ট থাকে। একইভাবে শরীরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যাই-ই প্রবেশ করবে, তার সাইড এফেক্ট থাকবে। অতিরিক্ত জল, নুন, চিনি, মদ, তেল সব কিছুরই সাইড এফেক্ট আছে। এটা মেনে নিয়েই বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের শুরু হয়। মডার্ন মেডিসিন এটি স্বীকার করে বলেই সে সাইড এফেক্টগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। একবার চিহ্নিতকরণ হলে রীতিমতো গবেষণা করে সেগুলিকে নির্মূল করার চেষ্টা করে। এটা যে কোনও বিজ্ঞান গবেষণার আবশ্যিক শর্ত যা সতত চলমান (continuous process)। মডার্ন মেডিসিনের চিকিৎসকরাও ওষুধ দেওয়ার সময় রোগীকে সম্ভাব্য সাইড এফেক্ট সম্বন্ধে সতর্ক করে দেন। সাইড এফেক্ট হলে তারও ব্যবস্থা নেন। যারা এই পদ্ধতি এড়িয়ে যান বা অগ্রাহ্য করেন তারা পারতপক্ষে রোগীর ক্ষতি সাধন করেন। | ১০) হোমিওপ্যাথি ওষুধের কোনো সাইড এফেক্ট নেই, কারণ তাতে জল/ অ্যালকোহল ছাড়া সক্রিয় উপাদান কিছু থাকেনা। তবে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতির একাধিক সাইড এফেক্ট আছে। অন্যদিকে হোমিও ওষুধের নামে অনেক অসৎ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক 'অ্যালোপ্যাথি' ওষুধ দিয়ে থাকেন, বিশেষত স্টেরয়েড। সেক্ষেত্রে সাইড এফেক্টও থাকবে। রোগী অজান্তে বা বলা ভালো ডাক্তারবাবুকে বিশ্বাস করে সেইসব ওষুধ খেয়ে যাওয়ার ফলে গুরুতর ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। |
| ১১) শরীরে প্রবেশ করে মডার্ন মেডিসিন কোন কোন কোষের ওপর কীভাবে কাজ করে তা স্পষ্ট ভাবে জানা যায়। | ১১) শরীরে প্রবেশের পর হোমিওপ্যাথি ওষুধ কোন কোষের ওপর কীভাবে কাজ করে জানা নেই। |
| ১২) চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাবার নিয়ম নেই কারণ শুধু মাত্র রোগের লক্ষণ থেকে রোগ নির্ণয় করা যায়না, রোগের কারণ যাকে পরিভাষায় 'প্যাথোফিজিওলজি' বলা হয়, একমাত্র চিকিৎসকই পারেন তা নির্ণয় করতে। তাছাড়া রোগের লক্ষণ আর রোগ এক জিনিস নয়। | ১২) চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াও ওষুধ খাওয়ার নিদান অতীতে ও বর্তমানে বহু হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক দিয়েছেন। (যদিও এটি নিয়ে হোমিওপ্যাথদের মধ্যেই মতবিরোধ রয়েছে।) কারণ হোমিওপ্যাথির 'সদৃশ বিধান' এর নিয়ম অনুসারে রোগের লক্ষণ থেকে পিছনে হিসেব করে, 'রিপার্টরি' দেখে মিলিয়ে নির্দিষ্ট ওষুধ খুঁজে নেওয়া যায়। সেটি বাড়িতে বসে কোনো হোমিওপ্যাথি না পড়া ব্যক্তিও করতে পারেন ও করেন। |
| ১৩) মডার্ন মেডিসিনের দৃষ্টিতে 'সদৃশ বিধান' এর নিয়ম মেনে, 'রিপার্টরি' দেখে রোগের লক্ষণ মিলিয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা একটি সিম্পটোম্যাটিক চিকিৎসা। এতে করে রোগের আসল কারণকে অনুসন্ধান করা হয়না। | ১৩) হোমিওপ্যাথির দৃষ্টিতে মডার্ন মেডিসিনে যেহেতু ভাইটাল ফোর্সকে কোনো ধর্তব্যের মধ্যেই আনা হচ্ছে না, কেবল রোগীকে দেখে আর প্যাথলিজক্যাল কিছু টেস্ট করেই রোগ নির্ণয় করা হচ্ছে, তাই যতই রোগের উৎস |

| | |
|---|---|
| | বলে জিন, প্রোটিন, হরমোন, জীবাণু ইত্যাদিকে ধরা হোক না কেন তা পারতপক্ষে রোগক্ষণ (সিম্পটোম্যাটিক) চিকিৎসার নামান্তর। হোমিওপ্যাথিতে একমাত্র ভাইটাল ফোর্সের ভারসাম্যহীনতাই প্রকৃত কারণ, বাকি সবই সিম্পটম! |
| ১৪) রোগের ইতিহাস শুনে আর রোগীকে পরীক্ষা করে প্রায় ৯০ ভাগ রোগ নির্ণয় করা যায়। বাকি ১০ ভাগ-এর জন্য রক্ত পরীক্ষা, এক্স রে, ইসিজি ইত্যাদির পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয়। | ১৪) রোগীর ভাইটাল ফোর্সকে মাথায় রেখে রোগীকে সামগ্রিক এবং স্বতন্ত্রভাবে বিচার করলে একমাত্র তবেই ১০০% রোগ নির্ধারণ করা যায়। রক্ত পরীক্ষা, এক্স রে, ইসিজি ইত্যাদি আসলে রোগীর রোগের তীব্রতা আর ব্যাপ্তিকেই জানতে সাহায্য করে, এর বেশি কিছু নয়। |
| ১৫) বর্তমান ল্যাবরেটরি মেডিসিনের যুগে রোগের নৈর্ব্যক্তিক ডায়াগনোসিস করার জন্যে রোগীকে চিকিৎসক কম সময় দিয়ে থাকেন, বরং রোগী অনেক বেশি সময় যন্ত্র আর ল্যাবরেটরির মাঝে কাটায়। এতে করে চিকিৎসক-রোগীর মধ্যে মানসিক দূরত্ব বাড়ার সম্ভাবনা থাকে তথা পারস্পরিক বিশ্বাস আর ভরসার জায়গাটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। | ১৫) হোমিওপ্যাথিতে রোগ নির্ণয়ের জন্যে চিকিৎসক অনেক বেশি সময় তাঁর রোগীকে দেন। ফলে চিকিৎসকের ওপর রোগীর বিশ্বাস আর ভরসার জায়গাটা দৃঢ় হয়। |
| ১৬) দিন দিন শতাধিক আবিষ্কার আর গবেষণার ফলে মডার্ন মেডিসিন এতটাই বিরাট জ্ঞান ভাণ্ডারে ভরে উঠেছে যে তার ক্রিয়াপদ্ধতি বা বিজ্ঞানসম্মত দিকগুলি একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে বুঝতে পারা উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি অনেক সময় চিকিৎসকরাও ধৈর্য ধরে রোগীকে রোগের সম্বন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন না। এরসঙ্গে রোগীকে ঘিরে একাধিক যন্ত্র ও তার প্রাণহীন যান্ত্রিকতা তো আছেই। সব মিলিয়ে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান মানুষের মনে এটির প্রতি একটি অজানা অচেনা ভয়, সংশয় আর অতীন্দ্রিয়বাদের (মিস্টিসিজম) জন্ম দেয়। যে কারণেই এই চিকিৎসায় কোনো রোগী সুস্থ হলে তা মিরাকেল হয়ে যায়, আর সুস্থ না হলে তা চিকিৎসকদের গাফিলতি আর অসততা হয়ে যায়। অথচ চিকিৎসা বিজ্ঞানের নিরিখে দুটোই সমান ভাবে স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য। | ১৬) হোমিওপ্যাথির গত ২০০ বছরে তত্ত্বগত ও বৈজ্ঞানিক কোনো উন্নতি সাধন না হওয়ার ফলে তার মৌলিক নিয়ম-কানুন ও ব্যবহার পদ্ধতি গড়পড়তা শিক্ষিত মানুষের কাছে অনেক বেশি বোধগম্য আর সহজ। পাশাপাশি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকেন্দ্র অনেক কম যন্ত্র নির্ভর হওয়ায় তা মানুষের কাছে অনেক বেশি স্বস্তিদায়ক ও গ্রহণযোগ্য। |
| ১৭) মডার্ন মেডিসিন ল্যাবরেটরি নির্ভর। ল্যাবরেটরি একটি লাভজনক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও এর মালিকানা বিজ্ঞানী বা চিকিৎসক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তির হাতে না থেকে থাকে ব্যবসায়ী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের হাতে। এর ফলস্বরূপ অযৌক্তিক, অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরি টেস্টের শিকার হন অনেক রোগী। এতে করে | ১৭) হোমিওপ্যাথির মধ্যে ল্যাবরেটরি টেস্টের আধিক্য না থাকায় রোগীরা এই প্রক্রিয়ায় প্রতারিত হন না। এখানে উল্লেখ্য আধুনিক চিকিৎসা নিতে গিয়ে প্রতারিত হওয়া আর হোমিওপ্যাথিতে না হওয়া আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার সাথে যুক্ত 'ব্যবসায়ী মানসিকতার ব্যক্তিসমষ্টির' স্বরূপ উন্মোচিত করে। এটি বিজ্ঞান হিসেবে |

| | |
|---|---|
| নানান সময় আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান ও সেই বিজ্ঞানের চিকিৎসকরা কলুষিত হন। | ও কার্যকরী চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে হোমিওপ্যাথিকে মডার্ন মেডিসিনের ওপরে স্থান দেয় না। এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটা অনুধাবন করা জরুরি। |
| ১৮) একইভাবে মডার্ন মেডিসিনে বড় বড় ওষুধ অযৌক্তিক, অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরি টেস্টের শিকার হন অনেক রোগী। এতে করে নানান সময় আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান ও সেই বিজ্ঞানের চিকিৎসকরা কলুষিত হন। প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি গবেষণা, নতুন ওষুধ আবিষ্কার, ওষুধ বিক্রি ও ওষুধের জনপ্রিয়তা — সব কিছুকেই ইনভেস্টমেন্ট আর রিটার্নের নিরিখে দেখে। এর মধ্যে দিয়েই যেমন যুগান্তকারী ওষুধ আবিষ্কার হয়, তেমন 'মি-টু ড্রাগ'ও তৈরি হয়। হাজার হাজার অযৌক্তিক, অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় ওষুধ ও তাদের কম্বিনেশন তৈরি হয়। অনেকসময় ব্যক্তিস্বার্থে সেগুলিকে প্রেস্ক্রাইব করতে গিয়ে অসৎ চিকিৎসকরা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানকে কলুষিত করেন। | ১৮) হোমিওপ্যাথির 'বিগ ফার্মা' এখনও পর্যন্ত এই ধরনের প্রলোভন ব্যাপকহারে শুরু করতে না পারলেও বিভিন্ন কর্পোরেট হোমিওপ্যাথি ক্লিনিকে প্যাকেজ সিস্টেমের মাধ্যমে রোগীদের কাছ থেকে বাৎসরিক মোটা টাকা আদায় করে প্রতারণার ঘটনা ক্রমশ উঠে আসছে। আসলে ব্যবসায়িক মানসিকতা রাখা, মানুষকে প্রতারিত করা এগুলি একদিকে আর বিজ্ঞান বা তার ক্রিয়া পদ্ধতি অন্যদিকে। বিজ্ঞান একটি ধারালো যন্ত্রের ন্যায়। কী ধরনের হাত তাকে ব্যবহার করছে তার ওপর নির্ভর করছে তা দিয়ে কল্যাণ হবে না ধ্বংস। |
| ১৯) মডার্ন মেডিসিনের বা বলা ভালো তাকে চালনাকারী অসৎ ব্যক্তিমানুষ/গোষ্ঠীর এই আচরণ গুলি অধিকাংশ সময়ে মডার্ন মেডিসিনের চিকিৎসকরা তথা গবেষকরাই সকলের সামনে আনেন। কোনো অযৌক্তিক, অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় টেস্ট বা ওষুধ কোনো ওষুধ কোম্পানি বা ল্যাবরেটরি প্রচলন করতে চাইলে এই চিকিৎসকরাই বাধা দেন। পক্ষপাতদুষ্ট, জালিয়াতি করা, ভুল বা নকল কোনো ট্রায়াল প্রকাশিত হল এই চিকিৎসকরাই সেটি নিয়ে সোচ্চার হন ও সেটিকে ছুঁড়ে ফেলেন। | ১৯) হোমিওপ্যাথিতেও অনেক পক্ষপাতদুষ্ট, জালিয়াতি করা, ভুল বা নকল ট্রায়াল বা স্টাডি প্রকাশিত হয়। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকও ল্যাবরেটরি ও ওষুধ কোম্পানির থেকে যদি কখনো উৎকোচ গ্রহণ করেন বা বাড়তি সুবিধে নিয়ে থাকেন, তা নিয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক সংগঠন বা তাদের নিয়ন্ত্রণ সংস্থা তার সত্যতা যাচাই করে কোনো ডাক্তারের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করেছে বা অন্য কোনো শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে বলে শোনা যায়নি। |

পুনশ্চ: সুপার অ্যাভোগ্যাড্রো ডাইলিউশন নিয়ে হোমিওপ্যাথির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বহু আলোচিত, তাই এই পার্থক্যটির নতুন করে উত্থাপন নিষ্প্রয়োজন। হোমিওপ্যাথদের যখন মডার্ন মেডিসিনের চিকিৎসকরা সমালোচনা করেন, তখন তা হয় হোমিওপ্যাথির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও তার পরীক্ষা-সাপেক্ষ কার্যকারিতার ওপর। যে কোনো চিন্তাশীল ও বিজ্ঞানের ইতিহাস অধ্যয়নকারী মডার্ন মেডিসিনের চিকিৎসক হোমিওপ্যাথির মানবিক, কম যন্ত্র নির্ভর, রোগীকে সামগ্রিকতায় দেখার দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্মান করেন ও সেগুলিকে যতটা সম্ভব আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে অন্তর্ভুক্ত করতে আগ্রহী থাকেন।

অন্যদিকে হোমিওপ্যাথির প্রবক্তাদের কাছ থেকে হোমিওপ্যাথির 'বৈজ্ঞানিক ভিত্তি' ও তার প্রমাণ করা বা না করা নিয়ে একাধিক, জোরালো, পক্ষপাতহীন ট্রায়ালের কথা একেবারেই শোনা যায় না। তারা বরং মডার্ন মেডিসিনের 'বাণিজ্যিক, ব্যবসায়িক ও প্রতারণামূলক' ঘটনাগুলিকে (যেগুলি কিনা ঐতিহাসিকভাবেই বিজ্ঞানকে মুনাফার কাজে অপব্যবহার করা অসৎ ব্যক্তিমানুষ/গোষ্ঠীর চরিত্র, চিকিৎসা বিজ্ঞানের চরিত্র নয়) তুলে ধরে মডার্ন মেডিসিনের 'চিকিৎসা পদ্ধতি' ও 'বৈজ্ঞানিক কাঠামোকে' ভুল বা অসম্পূর্ণ প্রমাণ করতে চান। পারস্পরিক তর্ক-বিতর্কে এই প্রবণতাগুলিকে সরিয়ে রেখে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী পথে মডার্ন মেডিসিন বনাম হোমিওপ্যাথির আলোচনাগুলি চালিয়ে গেলে তবেই একমাত্র একটি সুষ্ঠু, সর্বগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব, নতুবা নয়। উমা

# হোমিওপ্যাথি: একটি আলোচনা

সৌম্যকান্তি পণ্ডা

সময়টা অষ্টাদশ শতাব্দী। রহস্যময় পৃথিবী: ম্যাজিক, মন্ত্রশক্তি, ডাকিনীবিদ্যা, কুসংস্কারে ব্যাপ্ত চরাচর। প্লেগ, কলেরা এমনকি সাধারণ কাটাছেঁড়া থেকে বিষিয়ে ওঠা ঘায়ে প্রাণ চলে যাচ্ছে হাজার হাজার মানুষের। চিকিৎসা বলতে রক্ত বের করে ফেলে দেওয়া অথবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া। অজ্ঞান করার ওষুধ তখন স্বপ্নবিলাস। এই অমানুষিক চিকিৎসায় প্রাণ বাঁচছে যত না, যাচ্ছে তার বহুগুণ। ভয়ে লোকে পারতপক্ষে হাসপাতালমুখো হয় না। এই অবস্থায় জার্মান চিকিৎসক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান প্রথাগত চিকিৎসার বাইরে সেই সময়ের নিরিখে বৈপ্লবিক ধারণা আনলেন যার প্রথম শর্তই ছিল অন্তত ক্ষতি না করা। এই চিকিৎসার মূল নীতি: *১. রোগের সমতুল্য লক্ষণ সৃষ্টিকারী পদার্থ দিয়ে রোগের উপশম ২. মূল রাসায়নিককে অত্যন্ত লঘু মাত্রায় শরীরে প্রবেশ করানো*।

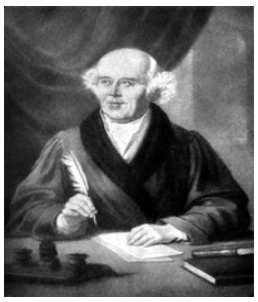

ফ্রেডরিক স্যামুয়েল হানিম্যান (১৭৫৫-১৮৪৩)

### ১. হোমিওপ্যাথি কি বিজ্ঞান?

১৭৮৯ সালে স্কটিশ চিকিৎসক উইলিয়াম কালেন-এর লেখা বই অনুবাদের সময় হ্যানিম্যান লক্ষ্য করেন সিঙ্কোনা গাছের ছাল প্রয়োগে ম্যালেরিয়ার অনুরূপ লক্ষণ তৈরি করে। এই লেখা থেকে হ্যানিম্যান ভীষণভাবে প্রভাবিত হন। পরবর্তীকালে তিনি নিজের দেহে সিঙ্কোনা ছাল থেকে একই রকম রোগলক্ষণ পান। তিনি ধারণা করেন সমলক্ষণ যুক্ত রাসায়নিক শরীরে প্রবেশ করালে তা রোগটি সারাতে সাহায্য করবে। এই নিয়ে প্রথম প্রবন্ধটি লিখলেন ১৭৯৬ সালে আর প্রবন্ধগুচ্ছ বই হয়ে বেরোল ১৮১০ সালে (organon of the rational art of healing)। এখানে বাদ রয়ে গেল: সমলক্ষণ তৈরি করা আরও অসংখ্য রোগ। অর্থাৎ, রোগের ডায়াগনোসিস না করে শুধুমাত্র লক্ষণভিত্তিক (symptomatic) চিকিৎসার ভিত্তি স্থাপন করা হল। ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্লাজমোডিয়াম তখনো আবিষ্কার হয়নি। সিঙ্কোনা ছাল খেয়ে কম্প দিয়ে জ্বর আসার কারণ এর মধ্যেকার অণু-গঠনে (মলিকুলার স্ট্রাকচার) অ্যালকালয়েডের উপস্থিতি।

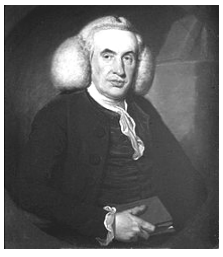

উইলিয়াম কালেন (১৭১০-১৭৯০)

অ্যাভোগাড্রোর বিখ্যাত অণুবাদ (সম-মোলার যে কোনো পদার্থে অণুর সংখ্যা ধ্রুবক। পরে আবিষ্কার হল সংখ্যাটি ৬.০২২x১০$^{২৩}$ ) এল ১৮১১ তে। অর্থাৎ হোমিওপ্যাথি আবিষ্কারের সময় পদার্থের অণুর ধারণাই আসে নি। কাজেই একটি রাসায়নিক শরীরে প্রবেশের পর শরীরে কি কি আণবিক পরিবর্তন হয় সে সম্পর্কিত কোনো ধারণাই হ্যানিম্যানের ছিল না। সেই আদিম চিকিৎসা ব্যবস্থার যুগে সে নিয়ে প্রশ্ন তোলারও অবকাশ ছিল না। হোমিওপ্যাথি রসায়নবিদ্যার ন্যূনতম বিয়োজনবাদেরও পুরোপুরি উল্টো। হোমিওপ্যাথির নীতি অনুযায়ী দ্রবণে দ্রাবকের পরিমান বাড়ালে শক্তি বাড়তে থাকে। এখন সাধারণ অঙ্কের হিসেব বলে : এক মোল পরিমাণ অণু অর্থাৎ হোমিও পরিভাষায় মাদার টিংচার এক ভাগ নিয়ে তার সাথে নয়ভাগ দ্রাবক আবার উৎপন্ন দ্রবণের এক ভাগের সাথে নয় ভাগ দ্রাবক এইভাবে এগিয়ে যেতে থাকলে ২৪ তম বারের পর কোনও অণু থাকা অসম্ভব। যদি এই ডাইলিউশন এক এক পর্যায়ে ১০০ ভাগে করা হয় তাহলে ১২ বারের পর দ্রবণটি অণুহীন হয়ে যাবে। ১০০-কে হোমিও হিসেবে C দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। অর্থাৎ ১২C-এর চেয়ে বেশি ডাইলিউট করা যে ওষুধ (?) হোমিও ধারণায় উচ্চ-শক্তির, তাতে আসলে মূল রাসায়নিকের একটি অণুও থাকে না। পরে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে কিন্তু কখনই অণুহীন দ্রবণের কাজ ব্যাখ্যা করা যায় নি। ১৯৮৮ সালে 'মলিকিউলার মেমোরি থিওরি অফ ওয়াটার' (জ্যাঁ বেঁভেনিস্ত) বলে

একটি তত্ত্বের অবতারণা করা হয় যেখানে বলা হয় মূল রাসায়নিকের একটি অণু না থাকলেও জলের অণুর স্মৃতিধারণ ক্ষমতার জন্য ১৪হোমিওপ্যাথিক ওষুধের কর্মক্ষমতা থেকে যায়। বাস্তবিক ক্ষেত্রে জলের অণুগুলির মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধন এত দ্রুত তৈরি হয় আর ভেঙে যায় যে স্মৃতি ধরে রাখার প্রশ্নই ওঠে না। পরবর্তী কালে এ জাতীয় কোনো দাবি কখনোই প্রমাণ করা যায় নি। ঝাঁকুনি দিয়ে অণুর শক্তি বাড়ানোর দাবিও সম্পূর্ণ নাকচ হয়ে যায়।

**২. তাহলে এত মানুষ যে ব্যবহার করছেন, তাঁরা কি সবাই বোকা?**

পৃথিবী জুড়ে প্রচুর মানুষ দাবি করেন (পড়ুন বিশ্বাস করেন) ওঝার ফুঁক, গুণিনের মাদুলি, জ্যোতিষীর পাথরে উপকার হয়। চরণামৃত, পীরের কালো সুতো, জন্ডিসের মালা নিতে থিকথিকে ভিড় হয়। বিশ্বাস— বিজ্ঞান নয়। আর আধুনিক চিকিৎসা (মাথায় রাখুন, অ্যালোপ্যাথি বলে আধুনিক চিকিৎসায় কোন শব্দ নেই। এটিও হ্যানিম্যান সাহেবের বানানো) বলতে মূলত পেনিসিলিন আবিষ্কারের পরবর্তী সময়কে বোঝায়। হোমিওবাদ ২০০ বছরেরও বেশি পুরনো। এই অল্প সময়ের মধ্যে আধুনিক চিকিৎসা প্রায় ঐশ্বরিক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। মেডিক্যাল ইনভেস্টিগেশন চিকিৎসার জগতে বিপ্লব এনেছে। এখন সব মানুষের বিশ্বাস বদলানো অসম্ভব বিশেষ করে ভারতের মতো দেশে যেখানে অশিক্ষা ও কুসংস্কার এক চিরকালীন সমস্যা। জানিয়ে রাখি সারা বিশ্বে একমাত্র ভারতীয় উপমহাদেশেই হোমিওপ্যাথির এত রমরমা। বেশিরভাগ উন্নত দেশ তাদের জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচি থেকে হোমিওপ্যাথিকে দূরে সরিয়ে রাখছে অথবা ব্যয় সংকোচন করছে। কোনো হোমিও ওষুধ FDA (Food and Drug Administration, USA) ছাড়পত্র পায়নি। আর শুধুমাত্র ব্যবহারকারীর সংখ্যা বিচার্য বিষয় হলে তাবিজ-মাদুলিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান মানতে হয়।

**৩. বহুদিনের রোগ হোমিও দিয়ে ভালো সারে, অ্যালোপ্যাথি শুধু ইমার্জেন্সির জন্য।**

আপৎকালীন অবস্থায় শরীরের কলকব্জা পাল্টে যায় না। ওষুধের কাজ করার পদ্ধতিও না। হোমিওপ্যাথি যেহেতু বারবার প্রমাণিত মূলত প্লাসিবো এফেক্ট দিয়ে কাজ করে, ইমার্জেন্সিতে এবং সত্যিকারের গুরুতর অসুখে হোমিওপ্যাথি কাজ করার প্রশ্নই ওঠে না। নিজে থেকেই কমে যাবে এমন রোগ ছাড়া হোমিওপ্যাথির কোনো ভূমিকা নেই।

**৪. কয়েকজন আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার ডাক্তারও হোমিও করেন শোনা যায়**

ব্যক্তিগত জীবনে একজন বিজ্ঞানের ছাত্র কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হলে তার দায় কি বিজ্ঞানের? বিজ্ঞানের ছাত্র যদি তাবিজ-মাদুলি পরে সেটা কি সত্যিই বিজ্ঞানের পরাজয়? বরং আয়ুষের শাখাগুলি থেকে পাশ করা ডাক্তারের অ্যালোপ্যাথি প্র্যাকটিস (ইচ্ছে করেই বারবার আধুনিক চিকিৎসা কথাটা লিখছি না , যাতে বুঝতে সুবিধে হয়) অর্থাৎ ক্রসপ্যাথি এক চিরকালীন সমস্যা।

**৫. তাহলে ভারত সরকার 'আয়ুষ'কে মেনে নিলেন কেন?**

যে কোনও দেশের নাগরিকের আদর্শ চাহিদা হল 'হেলথ ফর অল'। সবার জন্য বিনে পয়সায় আধুনিক চিকিৎসা। বিপুল জনসংখ্যা, অপ্রতুল ডাক্তার, ক্রমহ্রাসমান স্বাস্থ্য-বাজেট, সব মিলিয়ে যখন কোনোভাবেই আদর্শের কাছাকাছি যাওয়া যাচ্ছে না, তখন অন্তত আয়ুষের মাধ্যমে জনগণকে হাসপাতালমুখী করার প্রচেষ্টা। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এটি জোড়াতালি দেওয়া ব্যবস্থা।

**৬. অ্যালোপ্যাথি ওষুধের সাইড এফেক্ট বেশি**

আগেই দীর্ঘ আলোচনা করে দেখানো হয়েছে বেশিরভাগ হোমিও ওষুধে মূল রাসায়নিক কিছুই থাকে না। দু-ফোঁটা জল অথবা অ্যালকোহল বা চিনির গ্লোবিউলসে তো সাইড এফেক্ট হওয়ার কথা নয়। এফেক্ট হলে তবে না সাইড এফেক্টের প্রশ্ন! আর হোমিও ওষুধের মধ্যে স্টেরয়েড গুঁড়ো বা মডার্ন মেডিসিন ভরে দেওয়া নিয়ে বিতর্ক হয়েছে বহুবার। সাধারণ বিজ্ঞানসম্মত ধারণা বলে, বাইরে থেকে প্রবেশ করানো একটি রাসায়নিক ঠিক ডোজে দিলে শরীরে কিছু না কিছু খারাপ প্রভাব (side effect) ফেলবেই। এই জায়গায় আসে কস্ট-বেনিফিট অ্যানালিসিস। অর্থাৎ পথ-দুর্ঘটনা বন্ধ করতে আমি পথটাকেই উপড়ে ফেলবো কিনা।

**৭. তবু কাজ তো হয়**

শরীর একটি বহমান নদীর মত। রোগের একটা বড় অংশ শরীর নিজেই সারায়। আঁচিল (নন-ক্যান্সারাস), সামান্য হাঁচিকাশি যেগুলো এমনিতেই সারবে হোমিও তাতে মানসিক সান্ত্বনা দেয়। এই করতে গিয়ে কত কত

ক্যান্সার বা অন্যান্য প্রাণঘাতী রোগ শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছায় তা সংখ্যাতীত। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে প্লাসিবো চিকিৎসা তাহলে বাচ্চাদের জন্য ফলপ্রসূ হয় কিভাবে? উত্তরে জানাই: খাদ্যাভ্যাস এবং অন্যান্য জীবনযাত্রার পরিবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ। তাছাড়া বাচ্চাটির মা-বাবা নিজেরাই ভাবতে শুরু করেন বোধয় কাজ হচ্ছে.. একে বলে ইনডাইরেক্ট প্লাসিবো এফেক্ট।

**৮. আমি দেখিয়ে দিতে পারি কতজন উপকার পেয়েছেন...**

কোনও কিছু বিজ্ঞানসম্মত ভাবে প্রমাণ করতে হলে উপযুক্ত স্টাডি করতে হয়। তার দ্বারা প্রমাণ করতে হয় যে রোগটি নির্দিষ্টভাবে এই ওষুধের জন্যেই উপশম হয়েছে এবং এই ওষুধ না দিলে রোগটি সারতো না। নইলে তাবিজ এবং জ্যোতিষ -এর (সেখানেও সমস্যার সমাধান হয়েছে দাবি করা হয়) সাথে হোমিওপ্যাথির কোনও তফাৎ থাকে না। পুরো মেকানিজম, ফার্মাকোকাইনেটিক্স, ফার্মাকোডাইনামিক্স,সাইড এফেক্ট, লেথাল ডোজ না জেনে কোনো রাসায়নিককে ওষুধ বলা যায় না। বিজ্ঞান এখনো প্রমাণ করতে পারেনি হোমিও আদৌ ওষুধ কিনা...কাজ করা না করা এগুলো তার পরের কথা।

হ্যাঁ, এবার আপনি বলতেই পারেন...বিজ্ঞান কি সব ব্যাখ্যা করতে পারে নাকি? বিজ্ঞান ব্যাখ্যাতীত উপায়ে কাজ করে বললে সেটা শুধুমাত্র হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। তাতে আর যুক্তি থাকে না। কারণ, সেক্ষেত্রে মাদুলি বা তাবিজও নিজেদের ব্যাখ্যাতীত বিজ্ঞান বলে দাবি করতে পারে।

হ্যানিম্যান তাঁর সময়ে দাঁড়িয়ে যা ভেবেছিলেন তা নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক এবং অভাবনীয় কিন্তু সেইসাথে এটাও মাথায় রাখা দরকার যে বিজ্ঞানের ধর্মই নিজেকে পালটে নেওয়া। প্রতিনিয়ত নিজেকে নতুন নতুন রূপে প্রকাশ করা। হ্যানিম্যান নিজেই তাঁর বইয়ের পরিমার্জন করেন। পরিবর্তন-বিমুখ বর্তমান হোমিওপ্যাথি একপ্রকার ধর্মান্ধতা যেখানে হ্যানিম্যান ঈশ্বর যাঁর সমালোচনা করা চলে না।

**উমা**

# কত রকমের রোগ কীভাবে সেরে গেল হোমিওপ্যাথিতে?

## সব্যসাচী সেনগুপ্ত

সৌম্য সেনগুপ্ত জয়েন্ট পরীক্ষা দিয়েছে এই কয়েকমাস হল। এখন পরীক্ষার পর ছুটিতে মামার বাড়ি এসেছে। সৌম্যর ছোট মামা ডা. অলকেন্দু পাত্র টিবি রোগ বিশেষজ্ঞ। আসলে মামাকে ছোট থেকে দেখেই সৌম্যর ডাক্তারি পড়ার স্বপ্ন। মামার মতো যুক্তিশীল,দরদী, সৎ ডাক্তার হতে সেও চায়। সৌম্যর এক ক্লাসফ্রেণ্ড অরিত্র। ওর বাবা হোমিওপ্যাথি ডাক্তার। ওর কাছে সৌম্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার অনেক সুখ্যাতি শুনেছে, কত লোকের নাকি কঠিন জ্বর, ক্যান্সার, চামড়ার রোগ, টিউমার সেরে গেছে হোমিওপ্যাথি খেয়ে। পাশাপাশি এও শুনেছে যে 'অ্যালোপ্যাথি' চিকিৎসার অনেক সাইড এফেক্ট। কিন্তু সব কথায় ঠিক যেন ওর মন সায় দেয় না। অন্যদিকে রসায়নের বইতে অ্যাভোগ্যাড্রো প্রকল্প পড়ার পর ওর মনটা যেন আরো খুঁতখুঁত করতে থাকে। অরিত্রকেও এটা নিয়ে ও জিজ্ঞেস করেছে। অরিত্র বলেছে যে জলের একধরনের স্মৃতিশক্তি থাকে, তাই হোমিও ওষুধে কোনো ওষুধ না থাকলেও কাজ করে। ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারেনি সৌম্য। তাই এবার মামারবাড়ি এসেই ছুটেছে ছোট মামার কাছে। মনে হাজারো প্রশ্ন।

মামা ধৈর্য ধরে সব শুনলেন, তারপর একটু মুচকি হেসে শুরু করলেন —

দেখ সৌম্য, তোকে হোমিওপ্যাথদের মতো করে কিছু বিষয় বুঝতে হবে আগে। জরুরি।

দ্যাখ,ওনাদের মতে অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খুব কড়া। বাচ্চাদের স্যুট করে না। এত 'বেশি ডোজ'-এর ওষুধ নাকি বাচ্চাদের খাওয়ানোও যায় না। তাই বাচ্চারা হোমিওপ্যাথি খায়। তারপর ধর, সেল্ফ রেমিশন হল বা রোগ নিজে থেকেই সেরে গেল তো ভালো। না হলে, তারপর রোগী অ্যালোপ্যাথি খাবে। সে নাহয় রোগের চিকিৎসা হতে একটু দেরিই হল। তো, চট করে তো কড়া ওষুধ দেওয়া যায় না। খুবই মুশকিল। বলে মামা আবার একটু মুচকি হাসলেন। ইঙ্গিত বুঝতে পেরে সৌম্য জিজ্ঞেস করল — তাহলে জ্বর সেরে যায় কি করে?

—আসলে বেশ কিছু রোগেই সেল্ফ রেমিশন হয়। ধর এমনি ভাইরাল ফিভার। তাতে লোকে হোমিওপ্যাথি পুরিয়া

খেল। রোগ এমনিতেও সারতো। তেমনিতেও। লোকে সাধারণত বড় কিছু হলে হোমিওপ্যাথি দেখায় না।

— তাহলে কখন দেখায়?

— ধর অ্যালোপ্যাথিতে সন্তোষজনক কাজ হল না, হোমিওদের কথায় অ্যালোপ্যাথি ফেল! যেমন ধর ক্যানসার, ভিটিলিগো বা শ্বেতী, সোরিয়াসিস এই সব। অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসক বললেন — সারবে, কিন্তু সময় লাগবে অনেক বা কখনোই পুরোপুরি সারবে না। যে কদিন বাঁচবে বাঁচুক। এ সব ক্ষেত্রে স্নানজল বা হোমিওপ্যাথি বা টোটকা খুব লাগসই। মনের একটা শান্তি থাকে — কিছু একটা করছি।

— তবে আমাদের ক্লাসের মৈনাক যে বলে হোমিওপ্যাথি খেয়ে তার মায়ের আঁচিল সেরে গেছে?

— এরকম অনেক উদাহরণ পাবি। যথা আমার পিসিমা সেরে গেছেন। অমুকের মেজদিদা ইত্যাদি। এগুলোর প্রতিবাদ তুই ক্লিনিক্যাল স্টাডি দিয়ে যেগুলো বৈজ্ঞানিকরা করে থাকেন করতে পারবি না। এরিয়া ফিফটি ওয়ান বা এলিয়েনের কথা তো জানিস তোদের জেনারেশনের সবাই। সেগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে এতকিছু বলেও কি কিছু হয়েছে? তোকে একটা অন্য কথা বলি। এটা খুবই জরুরি পয়েন্ট। ধর তুই মেডিকেলে ঢুকলি, বড় ডাক্তার হলি। তোর কাছে রোগী এল। ভয়ঙ্কর বুকের মধ্যে ইনফেকশন। বুকের অবস্থা সাংঘাতিক। তুই জিগ্যেস করবি জীবনানন্দের মতো — এতদিন কোথায় ছিলেন?

উত্তরে বলবে — হোমিওপ্যাথি করছিলাম।

**প্র:** তাহলে এই অবস্থা হল কেন?

**উ:** হোমিওপ্যাথিতে রোগ বাড়িয়ে কমানো হয়। (যদিও এটা সাধারণ মানুষের বক্তব্য। হোমিওপ্যাথির ডাক্তারবাবুরা এরকম দাবি করেন কিনা জানিনা।) তুই হয়তো দেখলি রোগটা ততদিনে খুবই জটিল হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়। রেচনতন্ত্রের পাথর গলাতে বা পিত্তথলির স্টোন সারাতে হোমিওপ্যাথি নাকি খুবই কার্যকরী। কেন? কারণ অনেক ক্ষেত্রে এগুলো নিজেই বেরিয়ে যায়, অথবা পিত্তথলিতে স্লাজ (এক ধরণের থিতিয়ে পড়া পিত্তথলির পাথরের পূর্বাবস্থা বিশেষ) থেকে স্টোন ফর্মেশন হতে সময় লাগে বিস্তর। ততদিন, ব্যথা নেই। অথবা, এমনিতেই কিডনির পাথরের ব্যথা যাকে বলে রেনাল কোলিক বা পিত্তথলির প্রদাহের জন্যে অ্যাকিউট কোলেসিস্টেইটিসের ব্যথা, কয়েক হপ্তা/ দিন/ মাস পরপর হয়। মাঝের ওই সময়টা, রোগী যদি হোমিওপ্যাথি খায় তবে তা হোমিওর সুফল। এবার ধর অসহ্য ব্যথা হল। তুই আবার জিগ্যেস করবি জীবনানন্দের মতো-- এতদিন কোথায় ছিলেন?

**উ:** হোমিওপ্যাথি খাচ্ছিলাম।

**প্র:** কেন?

**উ:** এতদিন তো ওটা খেয়েই ভালো ছিলাম।

অথবা আরেকটা সম্ভাবনা। অ্যাক্সিডেন্টাল ফাইন্ডিং অফ পাথর, অর্থাৎ আলট্রাসোনোগ্রাফিতে ঘটনাচক্রেই পাথরটা ধরা পড়েছে। আগে থেকে কোনো অসুবিধে ছিল না। অনেকে তো আবার 'ইয়ারলি হেলথ চেকআপ'ও করে আজকাল। তাতে ওইসব প্রায়ই ধরা পড়ে। সে আরেক মজার গল্প, পরে একদিন শোনাবো। তো সেক্ষেত্রে রোগী সিম্পটমলেস এবং সিম্পটমলেসই থাকলো আজীবন।

মানুষ হোমিও খেল। না খেলেও থাকত সিম্পটমলেস। কিন্তু খেয়েছে। তাই অবশ্যই বুক ফুলিয়ে বলতে পারবে-- হোমিওতে সারবে।

আর ওই টিউমার সারার ব্যাপারটা? জিজ্ঞেস করলো সৌম্য।

- ইয়েস! টিউমার! টিউমার খুবই খারাপ বিষয়। সবাই ভাবে টিউমার মানেই ক্যানসার। অথচ তা নয় বুঝলি। ধরা যাক লাইপোমা বা সিবেসিয়াস সিস্ট হয়েছে রোগীর। এগুলোতে টিউমারের মত ফোলা ফোলা জিনিসই হয়, কিন্তু এগুলো টিউমার নয়, দেখতেই যা টিউমারের মত। তাই অপারেশন করে কাটলেও হয়। না কাটলেও ভয়ের কিছু নেই। অবশ্য ইনফেকশনের জন্য কাটা জরুরি হতে পারে। এ ছাড়া নয়।

এবার, এলোপ্যাথি বললো-- কাটতে হবে না।

কিন্তু তাতে রোগীর ভালো লাগবে না। টিউমার হয়েছে। অথচ চিকিৎসা হবে না? অতএব হোমিওপ্যাথি।

— বুঝলাম, বলল সৌম্য।

— আরে শোন, কিছু অন্য কেসও আছে। ইনফেকশন হয়ে সিবেসিয়াস সিস্ট হয়তো নিজে থেকেই বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। অথচ সেই হোমিওপ্যাথিই চলল। এবার কদিন বাদে পুঁজটুজ হয়ে একসা কান্ড। কিন্তু হোমিওপ্যাথি মতে ভয় নেই। রোগ বেড়ে কমছে। তারও কদিন বাদে, পুঁজ বেরিয়ে ফোলা একটু কমলো। ব্যাস। টিউমার কমে গেল। কদিন বাদে যদিও আবার হবে। কিন্তু তখনকার ব্যাপার তখন ভাবা যাবে। আপাতত হোমিওপ্যাথিতেই তো সারলো! ঠিক কিনা?

- ঠিকই বটে! হাসতে হাসতে মাথা নাড়ে সৌম্য!

**অনুলিখন — অর্ক বৈরাগ্য** উমা

# হোমিওপ্যাথি : নতুন বোতলে পুরনো চালাকি

গৌরব সাহা

এই লেখাটি যখন লিখছি তখন কোভিড ১৯-এর সংক্রমণ থেকে বাঁচতে ভারতীয় আয়ুষ মন্ত্রক আর্সেনিকাম অ্যালবাম ৩০ নামক একটি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খাবার সুপারিশ জারি করেছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই ভ্রূ কুঁচকেছেন বিভিন্ন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে হোমিওপ্যাথি খাওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

কোনও বিষয়কে ঠিকমতো জানতে এবং বুঝতে হলে কীভাবে তার উৎপত্তি হল সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা জরুরি। হোমিওপ্যাথির ইতিহাস জানতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে দু'শো বছর আগে। সময়টা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। ততদিনে নিউটনের হাত ধরে পদার্থবিজ্ঞানে বিপ্লব এলেও রোগব্যাধি সম্পর্কে মানুষের কোনো সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়নি। জীববিদ্যা বিশেষত মানবদেহের শারীরবিদ্যা এবং জৈবরসায়ন সম্পর্কে সে যুগের বিজ্ঞানীদের জ্ঞান ছিল নগন্য। 'জার্ম থিওরি অফ ডিজিজ' বা সহজভাবে বললে জীবাণু থেকে যে মানুষের শরীরে বিভিন্ন রোগের জন্ম হতে পারে সেই বৈজ্ঞানিক সত্য সম্পর্কে তখনকার চিকিৎসকেরা অবগত ছিলেন না। ওষুধ খাওয়ার পর কোনও উপসর্গ কমে গেলে সেটি কোন প্রক্রিয়াতে কমত অর্থাৎ সেই ওষুধের মেকানিজম অফ অ্যাকশন কী তা কেউ জানতেন না। তাই চিকিৎশাস্ত্র ছিল নানারকম অবৈজ্ঞানিক এবং বিভ্রান্তিমূলক তথ্যে ভরা। ফলে বহু ক্ষেত্রে সেই সময়ের বিজ্ঞানীরা যে সমস্ত রোগের তত্ত্ব দিয়েছিলেন তা ছিল অনুমানভিত্তিক, বৈজ্ঞানিক সত্যের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। সেইরকম একটি ঘটনার ফসল হল হোমিওপ্যাথি। স্যামুয়েল হ্যানিম্যান নামে জার্মানির একজন তরুণ ডাক্তার (যাকে হোমিওপ্যাথির জনক বলা হয়) সেই সময়ের চিকিৎশাস্ত্রের ব্যর্থতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে নতুন চিকিৎসা পদ্ধতির কথা ভাবতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল হ্যানিম্যানকে কিছু জিনিস বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল। তিনি দেখেছিলেন, বহু ক্ষেত্রে ওষুধ হিসেবে যে সমস্ত পদার্থ ব্যবহার করা হয় সেগুলির যা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তা মূল রোগের থেকে অনেক বেশি ক্ষতিকারক। সার্জারিতে অ্যানাস্থেশিয়ার আবিষ্কার না হওয়ায় সার্জারির পদ্ধতিগুলি ছিল বর্বরতার সামিল। ফলে অনেক সময় রোগীর কাছে রোগের থেকে রোগ নিরাময়ের পদ্ধতি বেশি পীড়াদায়ক হয়ে দাঁড়াত। এইরকম পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে হ্যানিম্যান তথাকথিত চিকিৎসাপদ্ধতি পরিত্যাগ করেন এবং নতুনভাবে ভাবনাচিন্তা করার উদ্দেশ্যে রসায়ন চর্চা শুরু করেন। সেই সূত্র ধরে, স্কটিশ রসায়নবিদ উইলিয়াম কালেন-এর একটি গবেষণাপত্র জার্মান ভাষায় অনুবাদ করার সময় ম্যালেরিয়া রোগে সিঙ্কোনা গাছের ছাল ব্যবহারের যে ব্যাখ্যা তিনি পড়েন তাতে তাঁর মনে হয় সেই ব্যাখ্যা সঠিক নয়। যদিও পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীরা সিঙ্কোনা গাছের ছালে কুইনাইন নামক এক রাসায়নিকের সন্ধান পান যা ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্লাজমোডিয়ামকে ধ্বংস করে কিন্তু সে সময়ে দাঁড়িয়ে কেউ জানত না যে ম্যালেরিয়া হয় কেন— কেন তাতে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে এবং সবথেকে বড় কথা হঠাৎ করে সিঙ্কোনা গাছের ছাল ব্যবহারে এই রোগে কীভাবে সুফল পাওয়া যাচ্ছে। বরং বলা ভালো তখনকার বিজ্ঞানের পক্ষে এত কিছু জানা সম্ভবও ছিল না। খুব স্বাভাবিকভাবেই স্বয়ং হ্যানিম্যানও তা জানতেন না। তিনি কালেন-এর থিওরিকে ভুল প্রমাণিত করার উদ্দেশ্যে রোজ অল্প পরিমাণে সিঙ্কোনা গাছের ছাল খেতে থাকেন। এতে করে তাঁর হালকা জ্বর, দুর্বলতা, বমিভাব ইত্যাদি কিছু উপসর্গ দেখা দেয় যার সাথে ম্যালেরিয়ার উপসর্গের সাদৃশ্য আছে। (এগুলি ছিল আসলে কুইনাইনের সাইড এফেক্ট যার আরেক নাম সিঙ্কোনিজম)। ম্যালেরিয়ার মতো একই ধরনের উপসর্গ দেখা দেওয়ায় হ্যানিম্যান সিদ্ধান্তে আসেন কোনো ওষুধ তখনই কার্যকর হবে যখন সেই রোগের উপসর্গ এবং ওষুধটি অল্প পরিমাণে কোনো সুস্থ ব্যক্তিকে খাওয়ালে তার শরীরে তৈরি উপসর্গ একই ধরনের হয়। হ্যানিম্যানের এই থিওরি 'প্রিন্সিপাল অফ সিমিলার' বা 'Like cures like' নামে পরিচিত। এরকম

একটি চূড়ান্ত রকমের অবৈজ্ঞানিক ধারণার ওপর ভিত্তি করে হোমিওপ্যাথির জন্ম দেন তিনি। কিন্তু হ্যানিম্যান কেন এই চিকিৎসা পদ্ধতির নাম দিয়েছিলেন 'হোমিওপ্যাথি' সে বিষয়ে একটু আলোকপাত করা যাক এবং সেই সূত্রে জেনে নেওয়া যাক 'অ্যালোপ্যাথি' শব্দটি কোথা থেকে এল।

১৮০২ সালে হ্যানিম্যান হোমিওপ্যাথি শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। (হোমিওপ্যাথি শব্দটি তৈরি হয়েছে গ্রিক শব্দ hòmoio মানে like এবং pàthos মানে বা suffering কষ্ট এই দুইয়ের সংমিশ্রণে।) তিনি বিশ্বাস করতেন কোনও ওষুধ বেশি পরিমাণে খেলে সেটি মানুষের শরীরে রোগ সারানোর বদলে সেই রোগের প্রকোপ বাড়িয়ে দেয়। সত্যি কথা বলতে সেই সময়ের প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি যে তত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল যার নাম হিরোইক ডিপ্লেশন থিওরি সেটিও ছিল হোমিওপ্যাথির মতো একটি অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কিন্তু অনেক বেশি কষ্টাদায়ক এবং রোগীকে বহু ক্ষেত্রে বিপুল সহ্যশক্তির পরিচয় দিতে হত। যেহেতু মানুষের শরীরের বহু অসুখই কোনও চিকিৎসা ছাড়াই নিজে থেকে সেরে যায় তাই তৎকালীন যুগের প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতির বদলে হোমিওপ্যাথি অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আর তার ফলে হ্যানিম্যান তাঁর বিখ্যাত থিওরি অফ ডাইলিউশন বা লঘুকরণের নীতিতে উপনীত হন। এই তত্ত্ব বলে যে একটি ওষুধকে যত বেশি লঘু করা যাবে তত তার শক্তি বাড়বে। ফলে প্রচলিত হিরোইক মেডিসিনের তত্ত্ব, যা বিশ্বাস করত যদি একজন ব্যক্তির দেহে কোনো রোগ প্রবেশ করে তবে সেই ব্যক্তিকে পার্জিং, রক্তমোক্ষণ, সোয়েটিং ইত্যাদির মতো কষ্টকর পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে নিয়ে গেলে তার শরীর থেকে সেই অসুখ দূর হয়, হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথি তার একদম বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই কারণে হ্যানিম্যান আর তাঁর অনুগামীরা তখনকার হিরোইক মেডিসিনকে বোঝাতে অ্যালোপ্যাথি শব্দটি ব্যবহার করেন। অ্যালোপ্যাথি মানে ছিল 'other than disease' এবং সে যুগের হোমিওপ্যাথরা বিশ্বাস করতেন অ্যালোপ্যাথি হল 'opposites treating opposites'। পরবর্তীতে ঊনিশ এবং বিশের শতকে যখন হোমিওপ্যাথির থিওরি একে একে ভুল প্রমাণিত হতে থাকে এবং বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের ওপর ভর করে চিকিৎসা শাস্ত্র তার মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা ছেড়ে আধুনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত হয়ে ওঠে তখন হোমিওপ্যাথরা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা পদ্ধতিকে ব্যঙ্গ করতে অ্যালোপ্যাথি টার্মটি ব্যবহার করা শুরু করেন। এখন অবশ্য অ্যালোপ্যাথি শব্দটির ব্যবহারের মধ্যে যে ব্যঙ্গার্থক মনোভাব ছিল তা লোপ পেয়েছে এবং আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির সমার্থক হিসেবে আমরা প্রায়শই এটি ব্যবহার করি কিন্তু আদতে এটি একটি অবৈজ্ঞানিক শব্দ। আজকের যুগে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা বলে কিছু নেই যা আছে তা হল বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক চিকিৎসা এবং হোমিওপ্যাথির মতো একটি ছদ্মবিজ্ঞান বা সিউডোসায়েন্স।

**বাংলায় একটা প্রবাদ আছে — 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর'। আজকের আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অন্যতম স্তম্ভ হল এভিডেন্স-বেসড মেডিসিন বা প্রমাণ নির্ভর চিকিৎসা। এখানে আপনি আপনার মন গড়া কথা বলতে পারবেন না। আপনাকে আপনার বক্তব্যের সপক্ষে তথ্য প্রমাণ পেশ করতে হবে। আপনাকে হাতে কলমে দেখাতে হবে যে হ্যাঁ আপনি যে কথাটি বলছেন তা সত্যিই সঠিক। মডার্ন মেডিসিনে যে ওষুধগুলি ব্যবহার হয় প্রত্যেকটি র‍্যাণ্ডমাইজড কন্ট্রোলড ট্রায়ালের তিনটি ধাপ পেরিয়ে তারপর বাজারে আসে।**

হ্যানিম্যানের থিওরি অফ ডাইলিউশন যে আদতে একটি অবৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা তা অতি দ্রুত প্রমাণিত হয় যখন বিজ্ঞানীরা ধীরে ধীরে অণু পরমাণু অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা ইত্যাদি ব্যাপারে অবগত হতে শুরু করেন। ভালোভাবে বোঝাতে আর্সেনিকাম অ্যালবাম থার্টির উদাহরণটিই নেওয়া যাক। এখানে ৩০ মানে ৩০সি। এই সি হল সেন্টিসিমাল স্কেল যা হ্যানিম্যান তৈরি করেন। এই স্কেল অনুসারে এক ঘর এগোনো মানে কোনো পদার্থকে তার একশত গুণ বেশি দ্রাবকে (জল বা অ্যালকোহলে) দ্রবীভূত করা। ধরুন আপনি ১ ভাগ আর্সেনিক নিলেন আর্সেনিকাম ওষুধ তৈরি করবেন বলে। এখন ১সি শক্তির আর্সেনিকাম ওষুধ তৈরি করতে গেলে আপনাকে সেই ১ ভাগকে ১০০ ভাগ জলে দ্রবীভূত করতে হবে। তারপর ২সি শক্তির ওষুধ তৈরি করতে চাইলে ১সি শক্তির ওষুধ থেকে ১ ভাগ ওষুধ নিয়ে তাকে আবার ১০০ ভাগ জলে মেশাতে হবে। এইভাবে জলের পরিমাণ বাড়ার সঙ্গে ওষুধের শক্তি বাড়বে। খুব সহজ বুদ্ধিতে বোঝা যায় ১সি শক্তির ওষুধে যে পরিমাণ আর্সেনিক থাকবে তা

২সি-এর থেকে কম। হ্যানিম্যান বললেন যেহেতু পরিমাণ যত কম হবে তত শক্তি বেশি হবে সেই কারণে হোমিওপ্যাথিতে ১সি-এর শক্তি ২সি-এর চেয়ে বেশি। কিন্তু মজাটা হল ৩০সি শক্তির বানাতে হলে ১ ভাগ আর্সেনিককে দ্রবীভূত হতে হবে ১০০৩০ জলে বা ১০৬০ ভাগ জলে। কিন্তু এই ১০৬০ ভাগ জল কতটা জল? আসুন একটা সহজ হিসেব করি। আমরা এত দিনে জেনে গেছি পদার্থের সব থেকে ক্ষুদ্রতম কণা যার মধ্যে পদার্থের সব ধর্ম বিদ্যমান তা হল অণু। অর্থাৎ কোনো পদার্থের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম পরিমাণ হল সেই পদার্থের একটি অণু। এবার সেই হিসেবে আর্সেনিকের ক্ষুদ্রতম পরিমাণস্বরূপ একটি আর্সেনিকের অণু নিলাম। এবার সেই অণু দিয়ে যদি ৩০সি শক্তির একটা ওষুধ বানাতে হয় তাহলে সেই অনুসারে জলের অণু লাগবে ১০৬০। এত জলের অণু রাখতে যে পরিমাণ পাত্র দরকার সেই পাত্রে তিনশো কোটি পৃথিবী ধরে যাবে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন হোমিও ওষুধে যা আপনাকে খাওয়ানো হচ্ছে তাতে মূল ওষুধের কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকছে না। ব্যাপারটা অনেকটা এই পৃথিবীতে যত মহাসাগর ও সাগর আছে তাতে এক চিমটে আর্সেনিকের গুঁড়ো ছড়িয়ে দেওয়ার মতো। তাই আপনি হোমিও ওষুধ খান আর কলের জল খান কোনো ফারাক নেই। হ্যানিম্যান যখন এই সমস্ত থিওরি বা তত্ত্ব দিয়েছিলেন সেই সময় পদার্থে ক্ষুদ্রতম আকার যে অণু-পরমাণু সেই ধারণা তখনও সেইভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। সুতরাং তাঁর এই সমস্ত থিওরিকে বুজরুকি বলা যাবে না আবার বিজ্ঞাসম্মতও বলা যাবে না। হ্যানিম্যানের পরে যাঁরা হোমিওপ্যাথি নিয়ে চর্চা শুরু করেন তাঁরা তাঁদের বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখতে সে সময়ের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নতুন নতুন অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে আসেন। মেমরি অফ ওয়াটার বা জলের স্মৃতিশক্তি তত্ত্বটি তাদের মধ্যে অন্যতম। হ্যানিম্যানের লঘুকরণের নীতি যখন অণু পরমাণু অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা ইত্যাদি ধারণা আসার পর বাতিলের খাতায় তখন এই মেমরি অফ ওয়াটারের থিওরি দিয়ে হোমিওপ্যাথির বৈজ্ঞানিক সত্যতা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন হোমিওপ্যাথরা। তাঁরা দাবি করেন জলের অণুর স্মৃতিশক্তি আছে অর্থাৎ জলে কোনো জিনিস ভালো করে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে মেশালে জলের অণু সেই পদার্থের গুণগুলো নিজেদের মধ্যে নিয়ে নেয় এবং সেই জলের অণু তখন ওই পদার্থের বদলে নিজেই কাজ করে। সেই হিসেবে সাগর নদীর জলে যুগ যুগ ধরে এত আবর্জনা এবং দূষিত পদার্থ মিশেছে যে জল আর পানের উপযুক্ত থাকতেই পারে না কারণ ওই দূষিত পদার্থের ধরণধারণ জলের অণুগুলি নিজেদের 'মেমরি কার্ডে' সেভ করতে করতে মেমরি ভর্তি করে ফেলেছে! যাইহোক এইরকম বেশ কিছু শুনতে চটকদার কিন্তু হাস্যকর ও অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নামানোর পর যখন হোমিওপ্যাথিকে আধুনিক বিজ্ঞান মোটামুটি ছদ্মবিজ্ঞান বলে ঘোষণা করে দিয়েছে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা ধীরে ধীরে নিজেদের দেশে হোমিওপ্যাথিকে নিষিদ্ধ করছে সেই মূহুর্তে এই একবিংশ শতকে এসে আমাদের দেশের হোমিওপ্যাথরা নিয়ে আসেন 'ন্যানো পার্টিকেল থিওরি'। টাইমস অফ ইন্ডিয়া পত্রিকাতে বেরোনো একটি প্রবন্ধ অনুসারে ২০১০ সালে বোম্বে আই আই টি থেকে এর ওপর একটা গবেষণামূলক লেখা বের হয়। চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে যায়। সেটা নিয়েও আমার এই লেখায় আলোচনা করা যেত। কিন্তু একটি ওয়েবসাইট আছে যেখানে হোমিওপ্যাথি সম্পর্কিত সমস্ত রিসার্চ পেপার থাকে (http://www.vitalinformer.com/) সেখানে এইরকম কোনো রিসার্চ পেপার পাওয়া যায় নি এবং অন্যান্য আই আই টি বা গবেষণাগারেও আর কোনও দিন এরকম কোনও ন্যানো পার্টিকেল পাওয়া যায় নি। সুতরাং এই থিওরিটিও বেরোনোর কয়েক বছরের মধ্যে সেটি বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়।

আচ্ছা এতো গেল হোমিওপ্যাথির তত্ত্বকথা। এর পর আসা যাক আসল বক্তব্যে। দেওয়া যাক সেই সমস্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর যেগুলিকে ছুঁড়ে দিয়ে হ্যোমিওপ্যাথির সমর্থকরা নিজেদের সঠিক প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে।

এক, এইরকম একটি 'ভন্ডামি' কেন আজকের যুগেও জনপ্রিয়?

দুই, কেন বহু লোক দাবি করে হোমিওপ্যাথি খেয়ে আমার রোগ সেরে গেছে?

তিন, কেন এত উচ্চ শিক্ষিত মানুষ এমন কি বেশ কিছু অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসকেরাও হোমিওপ্যাথি খায়?

চার, বিজ্ঞান তো আজও সব কিছুর ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রে কি সেই রকম হতে পারে না? আর সব যদি মিথ্যে হয় সরকার কেন তবে হোমিওপ্যাথিকে অনুমোদন দিচ্ছে?

যেহেতু বেশ তর্ক বিতর্কের জায়গায় চলে গেছে ব্যাপারটা তাই তর্ক শাস্ত্রের একটা কথা দিয়ে উত্তরগুলো

দেওয়া যাক। bad logic বা কুযুক্তি কী? একটা সহজ উদাহরণ দিচ্ছি। রাম ছাগলের দাড়ি আছে আর রামবাবুরও দাড়ি আছে তাই র‍্যমবাবু রাম ছাগল। এখন এই যুক্তির অসারতা এতটাই পরিষ্কার যে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধার্মিক-অধার্মিক নির্বিশেষে কাউকে বোঝাতে হবে না। কিন্তু তার মানে কি এই যে সব কুযুক্তি সহজে বোধগম্য? না তা নয়। এই যেমন ধরুন হোমিওপ্যাথি। হ্যানিম্যান যে তত্ত্ব দিয়ে ছিলেন সে বৈজ্ঞানিক বিচারধারায় গত একশো বছর আগে বাতিল হয়ে গেছে। তাহলে এখনও কীভাবে টিকে আছে? উত্তর হলো কুযুক্তি। এই রকম কুযুক্তি আপনি আর কোথায় দেখতে পাবেন? এই ধরুন জ্যোতিষ শাস্ত্রে পাবেন, পুরোনো ধর্ম গ্রন্থের লাইন তুলে তা দিয়ে এখনকার সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির ব্যাখ্যায় পাবেন। আসলে এই সমস্ত মানুষদের অভিসন্ধি হল যে কোনো প্রকারে তাদের পুরোনো বাতিল চিন্তা ভাবনাকে সমসাময়িক চিন্তাধারার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা। এই কারণে এখন জ্যোতিষীরা আপনাকে কেবল এইটুকু বলেন না যে আপনার ওপর শনি গ্রহের প্রভাব আছে। বরং আধুনিক বিজ্ঞানের থেকে কিছু ভারী শব্দ যেমন 'কসমিক রে', 'ডার্ক ম্যাটার' ইত্যাদি ধার করে নিজের বক্তব্য হাজির করে। একটু খেয়াল করলে মনে পড়বে আমেরিকার নাসা 'ব্ল্যাক হোল'-এর ছবি তোলার পর সংবাদপত্রে যখন চাউর করে খবর বেরোল তখন ট্রেন বাসে পোস্টার পড়ল 'ব্ল্যাক হোল-এর প্রভাব থেকে বাঁচতে এই বাবার কাছে যান।' অর্থাৎ সেই 'বাবা' সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিকে অপব্যবহার করে নিজের বুজরুকি বজায় রাখলেন। আবার যখন কেউ বলে ওঠেন গণেশের শুঁড় হল আসলে প্লাস্টিক সার্জারির উদাহরণ তখন তিনিও একইভাবে একটি কাল্পনিক ঘটনাকে আধুনিক বিজ্ঞানের মাধ্যমে বৈধতা দেন। একটু লক্ষ করে দেখুন এরা প্রত্যেকেই কিছু 'ভারী' 'বিজ্ঞান শোনায় এমন' বাজার চলতি শব্দ ব্যবহার করে তার পর নিজের ইচ্ছে মতো একটা তত্ত্ব সাজিয়েছেন। হোমিওপ্যাথিও খানিকটা একই রকম করে। কিন্তু হোমিওপ্যাথি এ ক্ষেত্রে যে বাড়তি সুবিধেটা পায় তা হলো তার কুযুক্তিকে খণ্ডন করতে যে বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধি লাগে তা জনমানসে কিছুটা অপ্রতুল। তাই কখনও 'ন্যানো পার্টিকেল' আবার কখনও 'মেমরি অফ ওয়াটারের' মতো তত্ত্ব হোমিওপ্যাথরা দেন যেগুলো শুনলে শিক্ষিত কিন্তু বৈজ্ঞানিক চর্চা কম এমন মানুষও দুবার ভাববেন- "হতেও তো পারে।"

এবার আসা যাক হোমিওপ্যাথির সমর্থনে সব থেকে বহুল আলোচিত যুক্তিটি নিয়ে যা হল হোমিওপ্যাথি কাজ না করলে এত লোকের রোগ সারল কী ভাবে? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ কিন্তু সেটি অনুধাবন করা গড়পড়তা জনসাধারণের পক্ষে একটু সময় সাপেক্ষ। সহজভাবে বললে বলা যায় যে আমাদের শরীরে যে সাধারণ অসুখগুলি হয় তার বেশির ভাগ শরীর নিজে থেকে সামলে নিতে পারে অর্থাৎ আপনি ওষুধ না খেলেও সেরে উঠতেন। শরীরের এই প্রতিরোধ ক্ষমতা বহু রোগে নিজেই যথেষ্ট কার্যকর। বরং দেখা গেছে বহু ক্ষেত্রে যদি রোগী তার চিকিৎসক এবং চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর ভরসা রাখে তবে ওষুধটি সামান্য চিনির দলা হলেও সেই রোগী অনেক তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠে। এর পেছনে এন্ডোরফিন এবং সমগোত্রের আরো কিছু কেমিক্যালকে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় চিহ্নিত করা হয়েছে। একে বলা হয় প্লাসিবো এফেক্ট বা রোগীতোষ ক্রিয়া।

তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে সবই কি প্লাসিবো এফেক্ট? না, বরং বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় হোমিওপ্যাথির চিকিৎসক 'অ্যালোপ্যাথি ওষুধ'ই তাঁর রোগীকে দিচ্ছেন বা হোমিওপ্যাথির ওষুধের মধ্যে সেটি মিশিয়ে দিচ্ছেন। বিভিন্ন চর্মরোগে স্টেরয়েড, জ্বরে প্যারাসিটামল, উচ্চ রক্তচাপে অ্যামলোডিপিন এখনকার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকরা প্রায়শই দিয়ে থাকেন। মনে রাখা দরকার সেই সব ওষুধ কিন্তু তাদের 'জলের স্মৃতিশক্তি'-র নীতিতে চলে না। তা সত্ত্বেও তাঁরা প্রেস্ক্রাইব করেন। কারণ তাঁরা তাঁদের প্যাথির ব্যর্থতা সম্পর্কে অবগত।

এসব সত্ত্বেও কেন বহু শিক্ষিত মানুষ এমনকি কিছু 'অ্যালোপ্যাথি' চিকিৎসকেরাও হোমিওপ্যাথি বিশ্বাস করেন? এখন কী বলুন তো বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়ে জ্ঞান থাকা আর বিজ্ঞানমনস্কতা এক নয়। তাই এইরকম কিছু মানুষের কুসংস্কার দিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানকে বাতিল করা যায় না বা সেই সমস্ত মানুষের সমর্থনে একটা অপবিজ্ঞান প্রকৃত বিজ্ঞান হতে পারে না। তার দায়ও আধুনিক বিজ্ঞান নেয় না।

তাহলে যে প্রশ্নটা থেকে যায় তা হল ভারতে হোমিওপ্যাথি টিকে আছে কীভাবে? তার 'কৃতিত্ব' যায় ভারতীয় আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর কাছে। গ্লোবালাইজেশনের হাওয়া মেট্রোপলিটন শহর ছাড়িয়ে এখন

গ্রামগুলিতেও লেগেছে। স্বাভাবিকভাবে বেড়েছে চাকচিক্য কিন্তু বাড়েনি উচ্চশিক্ষার হার, কমেছে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বরাদ্দ। অন্যদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কারণে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে খরচ বাড়ছে। ফলে অনেক নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত মানুষও খুব কঠিন অসুখ না হলে সরকারি হাসপাতালের ভিড় ঠেলে ডাক্তার দেখাতে যেতে পছন্দ করেন না। আর বেসরকারি হাসপাতাল তো বহুক্ষেত্রে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ফলে হোমিওপ্যাথির কেন্দ্রগুলি এখনও এই সমস্ত মানুষদের কাছে একটা বিকল্প স্বাস্থ্যব্যবস্থা হয়ে থেকে গেছে যেখানে তারা সহজে সুলভে ওষুধ ও চিকিৎসা পাচ্ছে।

বাংলায় একটা প্রবাদ আছে — 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর'। আজকের আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অন্যতম স্তম্ভ হল এভিডেন্স-বেসড মেডিসিন বা প্রমাণ নির্ভর চিকিৎসা। এখানে আপনি আপনার মন গড়া কথা বলতে পারবেন না। আপনাকে আপনার বক্তব্যের সপক্ষে তথ্য প্রমাণ পেশ করতে হবে। আপনাকে হাতে কলমে দেখাতে হবে যে হ্যাঁ আপনি যে কথাটি বলছেন তা সত্যিই সঠিক। মডার্ন মেডিসিনে যে ওষুধগুলি ব্যবহার হয় প্রত্যেকটি র‍্যাণ্ডমাইজড কন্ট্রোলড ট্রায়ালের তিনটি ধাপ পেরিয়ে তারপর বাজারে আসে। এই ট্রায়ালের বৈশিষ্ট্য হল এখানে যে সমস্ত মানুষের ওপর পরীক্ষা চালানো হয় তারা এবং তাদের যাঁরা ওষুধ দিচ্ছেন সেই সমস্ত চিকিৎসকও জানেন না কাকে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে আর কাকে প্লাসিবো হিসেবে চিনির দানা দেওয়া হচ্ছে। ফলে এখানে পক্ষপাতের (কনফার্মেশন বায়াস) কোনো প্রশ্ন থাকে না। এমনকি বাজারে ওষুধটি আসার পরও নজর রাখা হয় সেটি আশানুরূপ কাজ করছে কিনা। মডার্ন মেডিসিন কখনও দাবি করে না যে সে সব জানে,বা তার চিকিৎসা পদ্ধতির কোনো সাইড এফেক্ট নেই। বরং মডার্ন মেডিসিন আপনাকে সংখ্যাতত্ত্বের হিসেব কষে দেখিয়ে দেবে কোন ওষুধে কোন সাইড এফেক্ট কত শতাংশ ক্ষেত্রে হয়। অর্থাৎ আজকের চিকিৎসা ব্যবস্থার সার্থকতা এখানেই যে এটি সমসাময়িক বিজ্ঞানকে মেনে চলে এবং এর সপক্ষে যুক্তি দেবার জন্যে যে গবেষণাপত্রগুলি আছে তা বিশ্বজুড়ে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে গ্রহণযোগ্য।

এরপরেও অনেকে দাবি রাখেন যে এমন এক দিন আসবে যে দিন বিজ্ঞান হোমিওপ্যাথির মহিমা বুঝবে। না, সে দিন আসবে না। এটা ঠিক যে বিভিন্ন সময়ে তৎকালীন বৈজ্ঞানিক সমাজ একটি ব্যতিক্রমী তত্ত্বকে প্রথমে মানেনি অথচ পরে তা সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ গ্যালিলিওর কথা বলা যায়। হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রেও সেইরকম কিছু হবে এরকম ভাবা ভুল। কারণ বিজ্ঞান আজ যে যুক্তিগুলির ওপর ভর করে হোমিওপ্যাথিকে ছদ্মবিজ্ঞানের আখ্যা দিয়েছে সেই বৈজ্ঞানিক সত্যগুলির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে আজকের আধুনিক সভ্যতা। যেহেতু সেই বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি হাতে কলমে ঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে তাই সেই সমস্ত সত্যের বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকা হোমিওপ্যাথির তত্ত্বকথা আজকের যুগে বুজরুকি ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রকৃতপক্ষে ভারত সরকার বা রাজ্য সরকার হোমিওপ্যাথিকে কেন অনুমোদন করছে তা বুঝতে বিশেষ বিদ্যে লাগে না। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা খরচ সাপেক্ষ। সেখানে খালি ওষুধ দিলেই হবে না সে প্রমাণও চায়। অর্থাৎ বুকে ব্যথা হলে সেটা হার্ট অ্যাটাক না গ্যাসট্রাইটিস তা ই সি জি করে দেখে নিতে চায়। সুগারের লেভেলটা রক্তে ঠিক আছে কিনা তার জন্যে রক্ত পরীক্ষা করে। হোমিওপ্যাথি কিন্তু এসব দেখে না। প্যাথোলজি, ফিজিওলজি নিয়ে তাদের বিশেষ আগ্রহ নেই। আর তাই স্বল্প খরচের হোমিওপ্যাথি দিয়ে যাতে ভারতের প্রান্তিক মানুষগুলোকে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা না দিয়ে তাদের ভুলিয়ে রাখা যায় তারই চেষ্টা চলছে। একদম শেষে একটি তথ্য দিয়ে বক্তব্য শেষ করছি। হ্যানিম্যানের হাত ধরে যে জার্মানিতে হোমিওপ্যাথি শুরু হয়েছিল সেই জার্মানিই আজ জনস্বাস্থ্য বিমার আওতা থেকে হোমিওপ্যাথিকে বাতিল করেছে।

উমা

## প্রিয় লেখকদের প্রতি

কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারকারী লেখকরা পত্রিকার ই-মেলে ইউনিকোডে লেখা পাঠাবেন। হাতে লিখে পাঠালে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে কাগজের একপিঠে মার্জিন রেখে লিখুন। লেখা উৎস মানুষ-এর কার্যালয়-এর ঠিকানায় পাঠাবেন। লেখার সঙ্গে আপনার নাম-ঠিকানা-ফোন নম্বর-ই-মেলে (থাকলে) অবশ্যই পাঠাবেন।

# হ্যানিম্যানের ঐতিহাসিক ভুল

শুভাশিস চিরকল্যাণ পাত্র

হোমিওপ্যাথির আবিষ্কর্তা ডা. স্যামুয়েল হ্যানিম্যান হোমিওপ্যাথির দু'টি মূল নীতি ব্যক্ত করেছিলেন। একটি হল সদৃশ বিধান নীতি আরেকটি লঘুকরণের নীতি। বর্তমানে এই দুই নীতিই বৈজ্ঞানিকভাবে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। ডা. হ্যানিম্যান কেমনভাবে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন এবং এই বিষয়ে তাঁর ভুলটা কোথায় হয়েছিল তা খুব সহজ ভাষায় উদাহরণ সহযোগে বলছি। মানবদেহের একটি রোগের নাম ম্যালেরিয়া। এটি হয় একটি আণুবীক্ষণিক পরজীবী জীবাণুর জন্য, যা স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশার কামড়ের মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করে। রোগটি সারে নির্দিষ্ট মাত্রায় কুইনাইন নামক ওষুধ খেলে (বা ইনজেকশন নিলে), যা ঐ জীবাণুকে মেরে ফেলে। হ্যানিম্যান না জানতেন ম্যালেরিয়ার কারণ (তখনও ম্যালেরিয়ার জীবাণু আবিষ্কৃত হয়নি), না জানতেন কী করে কুইনাইন ম্যালেরিয়া সারায় (আধুনিক ওষুধ বিজ্ঞান তখনও আসেনি)। এর ফলে তিনি সম্পূর্ণ ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল সিঙ্কোনা গাছের ছাল (এই গাছের ছালে কুইনাইন থাকে) খেলে শরীরে ম্যালেরিয়ার মতো উপসর্গ সৃষ্টি হয়, আবার ওই গাছের ছালই ম্যালেরিয়া সারায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে (হ্যানিম্যানের মতে) যে পদার্থ কোনো উপসর্গ সৃষ্টি করে, সেটি অল্পমাত্রায় দিলেই সেই উপসর্গগুলি সেরে যায় (like cures like)। এটি একটি ভুল সিদ্ধান্ত, যা হোমিওপ্যাথির অন্যতম মূল নীতি। হ্যানিমান যদি জানতেন যে ম্যালেরিয়া হয় একটি জীবাণুর ফলে এবং তা সারে সিঙ্কোনার ছালে অবস্থিত কুইনাইন নামক রাসায়নিক পদার্থটি ওই জীবাণুটিকে মেরে দেয় বলে, তাহলে তিনি এইরকম ভুল করতেন না এবং হয়ত হোমিওপ্যাথিও আবিষ্কৃত হত না।

সে সময়ে ম্যালেরিয়ার জীবাণু বা এই রোগে কুইনাইনের কার্যপদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি। তবু ডা. হ্যানিম্যান যদি অধিকতর সচেতন ও বিজ্ঞানমনস্ক হতেন তাহলে তিনি তাঁর ভ্রান্তিগুলি এড়িয়ে যেতে পারতেন। যেমন ধরুন সিঙ্কোনার ছাল খেলে তাতে একটু গা গুলাতে পারে, বমিও হতে পারে; তাই বলে ম্যালেরিয়ার মতো ১ দিন ছাড়া কাঁপুনি দিয়ে উচ্চমাত্রার জ্বর হয় না, প্লীহাও (স্প্লিন) বাড়ে না। সুতরাং সিঙ্কোনার ছাল খেয়ে ম্যালেরিয়ার মতন লক্ষণ দেখা যায়, এমনটা ভাবা বেশ বাড়াবাড়িই বটে। আমরা এও জানি যে সিঙ্কোনার ছাল খেলে বমি ইত্যাদি যতটুকু লক্ষণ দেখা দেয় তা হয় সেই ছালে উপস্থিত নানা প্রকার উপক্ষারের (alkaloid-এর) প্রভাবে, যেগুলি পাকস্থলীতে ক্রিয়া করে রুগীর বমন ক্রিয়া ঘটায়। যদি কুইনাইন ইনজেকশন দেওয়া হয় তবে এসব হবে না, কিন্তু ম্যালেরিয়া সারবে। আমি আগেই বলেছি যে, কুইনাইন ম্যালেরিয়ার জীবাণুকে মেরে ফেলে বলে ম্যালেরিয়া সারে। কিন্তু সেটা না বুঝে হ্যানিম্যান মনে করলেন যে, অল্পমাত্রার কুইনাইন শরীরকে ম্যালেরিয়ার প্রতিরোধী করে তোলে। সুতরাং হ্যানিম্যানের চিন্তাধারা সার্বিকভাবেই ভুল বলে বুঝতে পারা যায়। প্রসঙ্গত ক্লোরোকুইন, মেফ্লোকুইন ইত্যাদি ওষুধের বড়ি প্রতি সপ্তাহে খেয়ে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করার ঘটনাটিও উক্ত ওষুধগুলির জীবাণুনাশক ক্রিয়ার জন্যই হয়, এবং তাও অল্পমাত্রার (হোমিওপ্যাথিক মাত্রার) ওষুধে হয় না। এক্ষেত্রেও আধুনিক বিজ্ঞান বিষয়টির ঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারে, হোমিওপ্যাথি তা পারে না।

হ্যানিম্যান আরো বলেছিলেন যে, কোনো ওষুধকে যত লঘু করা যায় তার কার্যকারিতাও তত বাড়ে। এটিও পুরাপুরি ভুল ও সাধারণ বুদ্ধির বিরোধী। হোমিও ওষুধের লঘুকরণ প্রণালীটি ঠিক মত বুঝলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে। হোমিওপ্যাথিতে বলা হয় যে, কোনো ওষুধকে যত লঘু করা যায় তার কার্যকারিতাও তত বাড়ে। এটি পুরো ভুল ও সাধারণ বুদ্ধির বিরোধী। লঘু করতে গিয়ে এমন অবস্থা হয় যে রসায়নের অণুবাদ (molecular theory) অনুযায়ী হোমিওপ্যাথিক ওষুধের প্রদত্ত মাত্রায় মূল ওষুধের একটি অণুও থাকে না, তাই সেগুলি কার্যকর হতে পারে না। নিম্নে উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করছি।

উদাহরণ হিসাবে আপনারা 'থুজা ২০০সি' নামের

হোমিও ওষুধটির কথা ভাবুন। এটি '২০০ শক্তির থুজা' নামে পরিচিত, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারবাবুদের মতে এটি খুবই হাই পাওয়ারের ওষুধ। ঝাউ গাছের মতো দেখতে 'থুজা অক্সিডেন্টালিস' নামে একটি গাছের পাতা থেকে এই ওষুধ তৈরি করা হয়। খুব সহজ হিসাবেই আমরা বুঝতে পারব যে, এক শিশি 'থুজা ২০০সি' ওষুধের পুরো শিশিতেও মূল ওষুধের একটি অণুও থাকতে পারে না। 'থুজা ২০০সি' শব্দগুচ্ছে 'সি' মানে শতমাত্রার লঘুকরণ (centesimal dilution) এবং ২০০ মানে হল অমন লঘুকরণ ধাপে ধাপে ২০০ বার করা হয়েছে! কেমনভাবে এটি করা হয় তা সোজা করে বলছি। মনে করুন প্রথমে এক ভাগ থুজার সঙ্গে ৯৯ ভাগ অ্যালকোহল মিশিয়ে ঝাঁকুনি দেওয়া হল হল। এই হল শতমাত্রার লঘুকরণ। এর ফলে যে লঘু দ্রবণ পাবেন তাকে বলব ১সি। এই ১সি মাত্রার ওষুধের এক ভাগের সঙ্গে পুনরায় ৯৯ ভাগ অ্যালকোহল মিশিয়ে যে আরো একশত গুণ লঘু দ্রবণ পাবেন তাকে বলব ২সি। এমনি করে পর্যায়ক্রমে ২০০ বার লঘু করলে যে দ্রব্যটি পাওয়া যাবে তাকে বলব থুজা ২০০সি। প্রতি বার শতমাত্রার লঘুকরণ করলে উৎপন্ন দ্রবণে অণুর ঘনত্ব তার পূর্বের দ্রবণের ১০০ ভাগের এক ভাগ হয়ে যায়। অমন ২০০ বার লঘু করলে উৎপন্ন লঘু ওষুধে অণুর ঘনত্ব মূল ওষুধের (১০০x১০০x১০০x১০০x১০০ ... ২০০ বার)-ভাগের একভাগ বা ১০০২০০ ভাগের এক ভাগ হয়। ১০০২০০ মানে ১-এর পিঠে ৪০০টি (চার শত) শূন্য, যা একটি বিরাট সংখ্যা! এক শিশি থুজার মাদার টিঙ্কচারে (থুজা গাছের পাতার আরক-এ) যতটা ওষুধ থাকে তাকে ১-এর পিঠে ৪০০টি শূন্য বসালে যে বিরাট সংখ্যাটি হয় তা দিয়ে (অর্থাৎ ১০এর ৪০০ ঘাত দিয়ে) ভাগ করুন। হিসাবমতো ততটা ওষুধই 'থুজা ২০০সি'-এর পুরা শিশিতে থাকতে পারে। এই পরিমাণটা অবিশ্বাস্য রকমের কম এবং অণুবাদ অনুযায়ী এতে একটি অণুও থাকতে পারে না! যারা অণু পরমাণুর ওজনের হিসাব জানেন তারা একথা সহজেই বুঝবেন। বিদ্যালয় স্তরের রসায়ন দিয়ে আমরা সে হিসাব বুঝে নিতে পারি।

একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনকে ১ (একক) ধরুন। তাহলে একটি হাইড্রোজেন অণুর ($H_2$)ওজন হবে ২। এই ২ হল হাইড্রোজেনের আণবিক গুরুত্ব (molecular weight)। তেমনি একটি অক্সিজেন পরমাণুর ওজন ১৬ এবং ১টি অক্সিজেন অণুর ($O_2$) ওজন হবে ৩২। ১৬ হল অক্সিজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব (atomic weight) এবং ৩২ হল তার আণবিক গুরুত্ব (molecular weight)। অক্সিজেনের অণুগুলি হাইড্রোজেনের অণুর চেয়ে ওজনে ভারী হলেও সংজ্ঞানুসারে ৩২ গ্রাম অক্সিজেন এবং ২ গ্রাম হাইড্রোজেনে অণুর সংখ্যা সমান হয়। ইতালির বিজ্ঞানী অ্যামিদিও অ্যাভোগাড্রোর নাম অনুসারে এই সংখ্যাটাকে অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা বলে। কোনো পদার্থের আণবিক গুরুত্ব যত ঐ পদার্থের তত গ্রামে অ্যাভোগাড্রো সংখ্যক অণু থাকবে। অ্যাভোগাড্রো সংখ্যার মান বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জানা গেছে, এই মান ৬-এর পিঠে ২৩টি শূন্য বসালে যে সংখ্যাটি হয় তার কাছাকাছি (আরো ঠিকভাবে বললে মানটা প্রায় ৬.০২৩x১০$^{২৩}$)। থুজার মূল রাসায়নিক পদার্থটির আণবিক গুরুত্ব যত তত গ্রামে তার অ্যাভোগাড্রো সংখ্যক (৬-এর পিঠে ২৩টি শূন্য!) অণু থাকবে। তাহলে তাকে যদি ১-এর পিঠে ৪০০টি শূন্য (যেটি একটি বিরাট সংখ্যা!) দিয়ে ভাগ করা হয় তবে তাতে একটি অণুও থাকতে পারে না। সুতরাং এক শিশি 'থুজা ২০০সি'-তে মূল ওষুধের পরিমাণটাও আসলে শূন্য হবে। ধাপে ধাপে অ্যালকোহল মিশিয়ে লঘুকরণের ফলেই এই দশা হয়। হিসাবমতো সমগ্র সৌরজগতের যা আয়তন, তত লিটার 'থুজা ২০০'-তেও অণুমাত্র ওষুধ থাকতে পারে না। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরমাণুর সংখ্যা প্রায় ১০-এর ৮০ঘাত (১-এর পিঠে ৮০টি শূন্য)। অর্থাৎ কেউ যদি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমান 'থুজা ২০০সি' খেতে পারেন (বাস্তবে অমনটা সম্ভব নয়) তবুও তার পেটে মূল ওষুধের একটি অণুও যাবে না! এখন প্রশ্ন হল ২০০সি পাওয়ারের থুজার শিশিতে কিছুমাত্র ওষুধ না থাকলে, তাতে আসলে আছেটা কী? উত্তর: তাতে আছে জল আর অ্যালকোহল। তাহলে রুগীর শরীরে ওষুধটা (??) কাজ করবে কী করে? এই বিষয়ে ডা. হানিম্যানের উত্তর হল,

কোনো হোমিও ওষুধের শিশিগুলিতে মূল ওষুধটা যত কম পরিমাণে থাকে (বর্তমান ক্ষেত্রে শূন্য পরিমাণে আছে) সেটি ততই শক্তিশালী হয়! কারণ তাঁর মতে লঘুকরণে ওষুধের পাওয়ার বেড়ে যায় (কথাটা সাধারণ জ্ঞানের বিরোধী)! অণু-পরমাণুর ধারণা তখন ছিল না বলে হোমিও ওষুধে যে আসলে কোনো ওষুধই থাকবে না সে কথা হ্যানিম্যানের পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়নি। তবে আজকের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকরা এবং বিজ্ঞানের ছাত্ররা সেকথা ভালই জানেন।

কোনো হোমিও ওষুধেই অণুমাত্র ওষুধ থাকে না বলে সেগুলি কোনো কাজও করে না। তবে কেউ যদি থুজার মাদার টিঙ্কচার ব্যবহার করেন (লঘু না করে) তবে তাতে শরীরে কোনো ক্রিয়া হতে পারে, কোনো রোগ সারে কিনা তা আমি জানি না (সারলে ভালোই)। কিন্তু থুজা বা আর কোনো ওষুধের মাদার টিঙ্কচারকে হোমিও ওষুধ বলা যাবে না। যেমন কোনো হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারবাবু আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের ওষুধ দিলে তাকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বলে না, এও তেমনি। বলতে গেলে খাঁটি হোমিও ওষুধ হল সেই ওষুধ যাতে কোনো ওষুধ নেই! এখন প্রশ্ন হল থুজার হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় কোনো কাজ হয় কি? অনেকে দাবি করেন থুজা নামের হোমিও ওষুধে আঁচিল ইত্যাদি চর্মরোগ সারে। তাদের কথা শুনে আমি খুবই অবাক হয়েছি কারণ হোমিও ওষুধে মূল ওষুধের অণুমাত্রও থাকে না বলে তা কোনোরকমে কিছুমাত্র কার্যকর হওয়ার কথা নয়। অবশ্য এখানে বলা দরকার যে থুজার মাদার টিঙ্কচার প্রয়োগ করলে কী ফল হয় তা আমি জানি না (হয়ত কোনো চর্মরোগ সারতেও পারে), কিন্তু সেটাকে তখন আর হোমিও ওষুধ বলা যাবে না। যদি হোমিওপ্যাথিক ডোজেই থুজা কোনো চর্মরোগ সারায় (আমার কাছে এটি অবিশ্বাস্য) তবে তা খুবই আশ্চর্য ঘটনা এবং অবশ্যই উপযুক্ত তদন্তের দাবি রাখে। এই থুজা গাছটি দেখতে অনেকটা ঝাউ গাছের মতো। এর পাতার আরকের সঙ্গে ধাপে ধাপে জল ও অ্যালকোহল মিশিয়ে বারে বারে লঘু করে (সুপারঅ্যাভোগাড্রো ডাইল্যুশন) থুজা নামের হোমিও ওষুধটি তৈরি হয়। হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিতে লঘু করার পর এতে আর থুজা গাছের কোনো অংশ কণামাত্রও থাকে না বলে (হোমিওপ্যাথির তথাকথিত ওষুধগুলি আসলে আদৌ কোনো ওষুধ নয়) আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিচার করলে এতে কোনো রোগ সারার কথা নয়। কোনো কোনো চর্মরোগ নিজেই সারে, কোনোটা হয়ত থুজার মাদার টিঙ্কচারে সারতে পারে (?), কিন্তু থুজার হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় কোনো ফল পাওয়ার কথা আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে ভাবা যায় না। একই হিসাবে কুইনাইনের হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় যে ম্যালেরিয়া সারে না, তা সবাই জানেন (ম্যালেরিয়ায় কুইনাইনের মাত্রা ৬০০মিগ্রা করে রোজ ৩ বার, অমন ৭দিন খেতে হয়)। সুতরাং হোমিওপ্যাথির দুটি মূল নীতিই ('like cures like' বা সদৃশ বিধানের নীতি এবং লঘুকরণের ফলে ওষুধের ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ার নীতি) যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, তাতে সন্দেহ কী? আশা করি হোমিওপ্যাথি কেন ভ্রান্ত এবং অবৈজ্ঞানিক তা পরিষ্কার হল। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাতেও (clinical trial-এ) হোমিওপ্যাথির কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়নি। হোমিও ওষুধ খেয়ে এবং ডাক্তারবাবুদের সুমিষ্ট ব্যবহারে মনের শান্তি হতে পারে, বহু রোগ আপনিই সারে — সেসব আলাদা কথা। এসব জেনেও যারা হোমিও ওষুধের ফোঁটা বা পুরিয়া (ফোঁটাকে চিনির গুঁড়োয় ঢেলে কাগজে পুরে পুরিয়া হয়) খেতে চান তারা অবশ্যই সেসব খেতে পারেন। তারা যে আসলে জল আর অ্যালকোহল (মদেও জল ও অ্যালকোহল থাকে) খাচ্ছেন (পুরিয়ার ক্ষেত্রে কিছু চিনি খাচ্ছেন) সেকথা এখানে বিস্তারিত বুঝিয়ে বলা হল।

এমতাবস্থায় আমি আবেদন করব হোমিওচিকিৎসকরা এই চিকিৎসাবিদ্যার অসারতার কথা বলুন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকদের মধ্যে ডাঃ শ্রীতন্ময় কুমার দাস, (BHMS) একটি সোশ্যাল মিডিয়ায় একবার লিখেছিলেন যে, 'ফ্রান্স, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, স্পেন এবং বৃটেনে হোমিও চিকিৎসা সরকারিভাবে বন্ধ। সেই সাথে হোমিও ঔষধ বানানোর রিসোর্সগুলিও ব্যবহার করা যাবে না। তাতে জাতীয় সম্পদ নষ্ট হচ্ছে বলে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়েছে।' বর্তমানে বিশ্বের নানা দেশের গবেষকরা হোমিওপ্যাথির অসারতা নিয়ে বলছেন এবং নানা জায়গায় হোমিওপ্যাথি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সংবাদমাধ্যমে সেসব তথ্য আপনারা মাঝে মাঝে পেয়ে থাকবেন। আমি আগেই বলেছি যে, হোমিও ওষুধগুলিতে কণামাত্র ওষুধ থাকে না এবং সেগুলি কোনো রোগের চিকিৎসায় কিছু মাত্র কার্যকর বলে উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সেক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন : আমাদের দেশেও কি হোমিওপ্যাথি বন্ধ হওয়া উচিত? আমার মনে হয় বিষয়টি নিয়ে ভাবনাচিন্তা খুব দরকারী। আমি মনে করি পাশকরা ও অভিজ্ঞ হোমিওচিকিৎসকরা হোমিওপ্যাথির অসারতা বিষয়ে সকলকে সচেতন করলে

তা মঙ্গলজনক হবে। বিশেষ করে দেশের হোমিওপ্যাথিক কলেজগুলির অভিজ্ঞ, বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষকদের মধ্যে যারা হোমিওপ্যাথির অসারতার ব্যাপারটা বুঝেছেন তাঁদের উচিত হবে হোমিওপ্যাথি যে ভিত্তিহীন এবং এর চর্চার ফলে যে মূল্যবান জাতীয় অর্থ অহেতুক নষ্ট হচ্ছে, সেই ব্যাপারে জনগণকে অবহিত করা। ডা. তন্ময়কুমার দাস মহাশয়ের সঙ্গে নানা বিষয়ে আমার মতের অমিল থাকলেও তিনি নিজে একজন পাশ করা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হয়েও যে এই চিকিৎসাপদ্ধতির অসারতার কথা মানুষকে জানিয়েছেন সেজন্য তিনি আমার ধন্যবাদের পাত্র। BHMS কোর্সটি বন্ধ করা হোক। হোমিওপ্যাথিক কলেজগুলিতে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান পড়ানো হোক। ইতিমধ্যে পাশ করা হোমিওচিকিৎসকদের ব্রিজ কোর্স করিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূল ধারায় আনা হোক। যারা মনে করেন যে হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রে কিছুমাত্র বৈজ্ঞানিক সার আছে, তারা চাইলে বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করতে পারেন। আমি তাদের দলে না হলেও উপযুক্ত যুক্তিপ্রমাণ পেলে সর্বদা নিজের মত বদল করে থাকি। বিজ্ঞানের জয় হোক।

**উ মা**

# হোমিওপ্যাথি: ভৌত রসায়নের দৃষ্টিতে

## রুদ্রনারায়ণ সমাজদার

হোমিওপ্যাথির জন্ম উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে, স্যামুয়েল হ্যানিম্যান এর বিখ্যাত 'অর্গানন' বই-এ।[১] হ্যানিম্যান বিশ্বাস করতেন বিষে বিষক্ষয় তত্ত্বে : similia similibus curentur! অর্থাৎ সাধারণ ভাবে বুঝতে গেলে, যা সুস্থ মানুষকে অসুস্থ করে, তাই খুব অল্প পরিমাণে অসুস্থ মানুষের শরীরে প্রবেশ করে রোগ থেকে মুক্তি দিতে পারে। এখন 'অল্প পরিমাণ' মানে ঠিক কতটা অল্প? এখানেই সমস্যার শুরু। হ্যানিম্যান-এর তত্ত্ব অনুযায়ী, ইনফাইনাইট ডাইলুশন বা হোমিওপ্যাথিক লঘুকরণ ছাড়া এ ওষুধ কাজ করে না। লঘুকরণের চূড়ান্ত অবস্থায় (ইনফাইনাইট ডাইলুশন)-এ পৌঁছলে, ভৌত রসায়নের অঙ্কের দিক থেকে দেখলে, ওষুধের একটা মলেকিউলও বাকি থাকার কথা নয় সলভেন্ট/ ডাইলুয়েন্ট-এ (চিত্র১)। এক শিশি হোমিও ওষুধে যদি শুধু জল/ইথানলই বাকি রইল, তো রোগের হরণ করল কে?

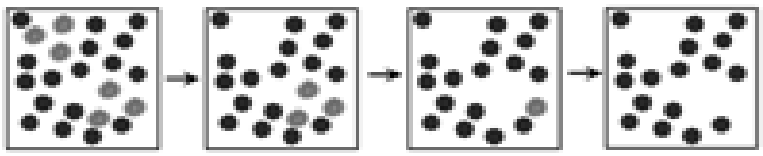

চিত্র১: হোমিওপ্যাথিক লঘুকরণ (ডাইলুশন)। ধরা যাক হোমিওপ্যাথিক ওষুধের অণুটি ছাই রঙের, দ্রাবকের অণুটি কালো রঙের (সলভেন্ট মলেকিউল)। বাঁ দিক থেকে ডান দিকে গেলে ওষুধের ঘনত্ব (কনসেনট্রেশন) কমছে। একদম বাঁ দিকের বাক্সটিতে ওষুধ ও দ্রাবক (সলভেন্ট)-এর অনুপাত (রেশিও) ৬:১৭; এটি কমে ১:১৭-য় দাঁড়িয়েছে ডান দিক থেকে দ্বিতীয় বাক্সটিতে। একদম ডান দিকের বাক্সটিতে ১৭টি দ্রাবক অণু (সলভেন্ট মলেকিউল)-এর জন্য একটি ওষুধের অণুও বাকি নেই। হ্যানিম্যান এর তত্ত্বানুসারে হোমিও ওষুধ কাজ করে ১:১০$^{৬০}$ বা তার চেয়েও বেশি লঘুকরণে। স্কুলপাঠ্য ভৌতরসায়নের অঙ্ক দিয়ে প্রমাণ করে দেওয়া যায় ১:১০$^{৬০}$ লঘুকরণে একটি ওষুধের মলেকিউল পেতে হলে যতগুলি সলভেন্ট মলেকিউল সংগ্রহ করতে হবে তা পৃথিবীর আকারের কোনো পাত্রে ধরানো সম্ভব নয়!

ফরাসী ইমুউনোলজিস্ট, শাক বেনভেনিস্তে এই বিচিত্র প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন বিংশ শতাব্দীর আশির দশকের শেষের দিকে। বেনভেনিস্তে হিউম্যান পলিমরফোনিউক্লিয়ার বেসোফিল এর সাথে অ্যান্টি-IgE অ্যান্টিবডির রিঅ্যাকশন পরীক্ষা করেন, অ্যান্টি-IgE অ্যান্টিবডির বিভিন্ন ডাইলুশনে। বেনভেনিস্তে দেখান, ১:১০$^{১২০}$ ডাইলুশনেও অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি রিঅ্যাকশন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।[২] ১:১০$^{১২০}$ ডাইলুশনে কোনো মলেকিউলের অস্তিত্বের প্রমাণ মানে ভৌতরসায়নের ভিত নাড়িয়ে দেওয়া এবং হোমিওপ্যাথির তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি দেওয়া। স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞান জগতে বেনভেনিস্তের গবেষণাপত্রটি আলোড়ন সৃষ্টি করে।[৩]

নেচার পত্রিকার সম্পাদক জন ম্যাডক্স পত্রিকার ওই সংখ্যার সম্পাদকীয়তে "When

to believe the unbelievable" তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন।[৪] ম্যাডক্স কিন্তু বেনভেনিস্তের আবিষ্কার নিয়ে মস্করা করেন নি, বা আজগুবি ঘটনা বলে উড়িয়ে দেন নি। এক সাধারণ জ্ঞানপিপাসু চিন্তাবিদের মতো তিনি মুক্ত দৃষ্টিতেই দেখেছিলেন এবং প্রশ্ন করেছিলেন: "The principle of restraint that applies is simply that, when an unexpected observation requires that a substantial part of our intellectual heritage should be thrown away, it is prudent to ask more carefully than usual if the observation may be incorrect"।

বেনভেনিস্তে নিজেও তাঁর গবেষণার ফলাফল বিজ্ঞানের কোনো স্থাপিত নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। তিনিও মুক্ত চিন্তার মানুষ ছিলেন — তাঁর গবেষণাগারে করা পরীক্ষাগুলি ইউরোপের অন্যান্য গবেষণাগারে স্বাধীনভাবে পুনর্বার করে দেখার অনুমতি দেন। বেনভেনিস্তের ধারণা ছিল: জলের মধ্যে জীবদেহে কোনো বিশেষ ক্ষতিকর পদার্থ/অণু (অ্যান্টিবডি মলেকিউল)-এর একটি বিশিষ্ট আকার (স্ট্রাকচার) থাকে। যদি এবার জলে অণুর দ্রাবণ (সলিউশনটি) ক্রমাগত আরো জল দিয়ে লঘুকরণ (ডাইলিউট) করা হতে থাকে, অতি লঘুকরণ (ইনফাইনাইট ডাইলুশন) এর সময়ে আর একটি অণুও জলে বাকি থাকবে না। কিন্তু জল ওই অণুর আকারটি কোনোভাবে মনে রেখে

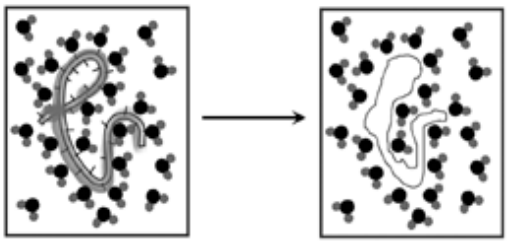

চিত্র ২: জলের স্মৃতিশক্তি বা ওয়াটার মেমরি। বাঁ দিকের বাক্সটিতে একটি ওষুধের অণু পেঁচানো রেখা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। জলের মলেকিউলগুলি গোলাকারভাবে দেখানো হয়েছে (হাইড্রোজেন: হাল্কা; অক্সিজেন গাঢ়)। ডান দিকের বাক্সটিতে পেঁচানো রেখা দিয়ে চিহ্নিত করা মলেকিউলটি আর নেই, কিন্তু তার ছাপ স্পষ্ট। জলের মলেকিউলগুলি নিজেদের মধ্যের ইন্টারমলেকিউলার ইন্টারঅ্যাকশন-এর মাধ্যমে যেন এই অবয়ব ধরে রেখেছে। এই অবয়বের অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী হলে চলবে না, জল দীর্ঘ সময় এই অবয়ব ধরে রাখতে পারলে তবেই এর প্রভাব মানুষের শরীরে পড়া সম্ভব, ইনফাইনাইটলি ডাইলিউট করা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খাওয়ার পর।

দেবে। একে সেই সময়ে নাম দেওয়া হয় জলের স্মৃতিশক্তি (ওয়াটার মেমরি) (চিত্র২)। অণুর অবর্তমানেও তার এক চিহ্ন যেন জলে রয়ে যায়। এই চিহ্নের দ্বারাই মলেকিউল তার অবর্তমানেও নিজের অস্তিত্বের জানান দেয় — অতি লঘুকরণেও হোমিওপ্যাথিক ওষুধের অণু কাজ করে।

বেনভেনিস্তের গবেষণার ফলাফল যাচাই করার জন্য ম্যাডক্স এক কমিটি গঠন করেন। কমিটি অবশ্য বেনভেনিস্তের ফলাফল রিপ্রোডিউস (পুনঃপ্রতিষ্ঠা) করে উঠতে পারে নি।[৫] কমিটিতে বিখ্যাত জাদুকর জেমস রনডিকে রাখা নিয়ে বেনভেনিস্তে বেশ অসন্তুষ্ট হন। তাঁর মনে হয়েছিল কমিটির সদস্যরা বদ্ধপরিকর তাঁর কাজে ভুল বার করার জন্য। বিজ্ঞানীর মুক্তচিন্তার বদলে তাঁরা ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর কাজকে কালিমালিপ্ত করতে চান। সম্পাদক ম্যাডক্সকে লেখা চিঠিতে, বেনভেনিস্তের এই মনোভাব স্পষ্ট: "Salem witchhunts or McCarthy-like prosecutions will kill science. Science flourishes only in freedom. We must not let, at any price, fear, blackmail, anonymous accusation, libel and deceit nest in our labs."।[৬] বেনভেনিস্তের গবেষণার ফলাফল পৃথিবীর কোনো গবেষকই আজ অবধি রিপ্রোডিউস করে উঠতে পারেন নি।

জলের স্মৃতিশক্তি বর্তমান ভৌতরসায়নের নিয়মে ব্যাখ্যা করা যায় না। জলের অণুরা একে অপরের সাথে পারস্পরিক ক্রিয়া (ইন্টারঅ্যাক্ট) করে হাইড্রোজেন বন্ডের মাধ্যমে। এই হাইড্রোজেন বন্ড ভাঙা-গড়া চলে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে: ১০-১২ সেকেন্ড বা তার থেকেও কম এদের ইন্টারঅ্যাকশন লাইফটাইম।[৭] এইরকম অবস্থায় কোনো দীর্ঘস্থায়ী নিরাকার অবয়বের জলের মধ্যে অস্তিত্ব থাকা প্রায় অসম্ভব। জলের ডায়নামিক্স নিয়ে তাত্ত্বিক ও পরীক্ষামূলক ভৌতরসায়নে গবেষণা অনেক দূর এগিয়েছে।[৮] কিন্তু ওয়াটার মেমরির কোনো প্রমাণ আজও অধরা।

বিভিন্ন সময়ে হোমিও বড়ির এন এম আর স্পেকট্রা নিয়ে অন্তত সুগার আর এথানল এর চিহ্ন ছাড়া আর কিছু দেখা যায় নি। আইসিপি - এইএস (ICP-AES) করে কোনো মেট্যালিক ট্রেস ও দেখা যায় নি।[৯] হোমিওপ্যাথি নিয়ে কোনো স্ট্যাটিসটিকাল ক্লিনিকাল ট্রায়াল-এর গবেষণাপত্রের অস্তিত্ব প্রায় নেই (অন্তত ভালো, পিয়ার রিভিউড, হাই ইম্প্যাক্ট মেডিকাল জার্নালে)।

বেনভেনিস্তে মারা যান ২০০৪ সালে। শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁর ওয়াটার মেমরির ওপর বিশ্বাস অটুট ছিল।[১০,১১] প্রায় দুশো বছর আগে, ইংল্যান্ডের এক তরুণ কবি, জন কীটস, তাঁর মৃত্যুশয্যায় নিজের এপিটাফ রচনা করে গেছিলেন: "Here lies one whose name was writ in water'। বেনভেনিস্তের সমাধিতে কি লেখা আছে জানি না, তবে এই এপিটাফটি তাঁর জীবনেরও যেন সারাংশ।

আজকের দিনেও অনেকে হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস করেন এবং বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সাথেই বলেন এই ওষুধে তাঁদের উপকার হয়। কেন হয়, তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। কিছু ক্ষেত্রে প্লাসিবো এফেক্ট, কিছু ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথির বড়িতে না জানিয়ে মেশানো সাধারণ ওষুধ (প্রেসক্রিপশন ড্রাগ); এভাবে হোমিওপ্যাথির সাফল্য বোঝার চেষ্টা করা যায়।

ব্যক্তিগত ভাবে হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস যে কেউ করতেই পারেন, এটা চিন্তার স্বাধীনতা। তবে যতদিন হোমিওপ্যাথির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না পাওয়া যায়, ততদিন অসুস্থ বা অসহায় মানুষকে চিকিৎসার নাম করে ভুল অবৈজ্ঞানিক পথে চলতে প্ররোচনা দেওয়া অন্যায়। বিজ্ঞান মুক্ত চিন্তার সাধনা — সব তত্ব খোলা মনে বিচার করাই শ্রেয়। যদি কোনো তত্ত্ব কয়েকশো বছর ধরে গড়ে তোলা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পরিকাঠামো এক ধাক্কায় ভেঙ্গে দিতে চায়, তবে সেই তত্ত্বকে খানিকটা সাবধানতার চোখেই দেখা উচিত। অন্ধকারে আলো খোঁজা, বিশৃঙ্খলার মধ্যে প্যাটার্ন দেখার চেষ্টা, মানব মনের আদিমতম প্রবৃত্তির মধ্যে অন্যতম। মহামারীর এই দুঃসময়ে আমরা সবাই এই বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার আপ্রাণ প্রচেষ্টায় মগ্ন। তবু, যা ব্যাখ্যা করা যায় না, যে বিশ্বাস অন্ধ, তার ওপর নিজের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ রূপে সঁপে না দিলেই মানব জাতির মঙ্গল।

**তথ্যসূত্র:**


১. Hahneman, S. The Homeopathic Medical Doctrine Or "Organon of The Healing Art": New System of Physic Dublin: W. F. Wakeman, 1833.

২. Benveniste, J. et. al. Human Basophil Degranulation Triggered by Very Dilute Antiserum Against IgE *Nature* 1988, 333, 816-818.

৩. Pool, R. Unbelievable Results Spark a Controversy *Science* 1988, *241, 407.*

৪. Maddox, J. When to Believe the Unbelievable *Nature* 1988, *333*, 787.

৫. Maddox, J. Waves Caused by Extreme Dilution *Nature* 1988, *334*, 760-763.

৬. Benveniste, J. Dr. Jacques Benveniste Replies *Nature* 1988, *334*, 291.

৭. Luzar, A; Chandler, D. Effect of Environment on Hydrogen Bond Dynamics in Liquid Water *Phys. Rev. Lett*. 1996, *76*, 928-931.

৮. Bagchi, B. Water in Biological and Chemical Processes: From Structure and Dynamics to Function Cambridge University Press, 2013.

৯. Unpublished data from experiments conducted personally, out of curiosity.

১০. Ball, P. The Memory of Water *Nature News* 2004 (DOI: 10.1038/news041004-19)

১১. Ball, P. "Here lies one whose name was writ in water" *Nature News* 2007 (DOI: 10.1038/news070806-6)


উমা

## উৎস মানুষ-এর দাম বাড়ছে

**বেশ কয়েক মাস ধরে ছাপা, কাগজ, বাঁধাই ইত্যাদি খরচ বেড়েছে। তার সঙ্গে পত্রিকার ওয়েবসাইট চালানোর খরচও রয়েছে। বলা বাহুল্য ওয়েবসাইটে পত্রিকা পড়ার জন্য এখনও আলাদাভাবে কোনও চাঁদা দিতে হয় না। সব মিলিয়ে আমাদের পক্ষে পত্রিকা প্রকাশ করার কাজ দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। তাই, আপাতত, আগামী জানুয়ারি ২০২১ থেকে পত্রিকার দাম হচ্ছে প্রতি সংখ্যা ৩০ টাকা, বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা (ডাক খরচ আমাদের; বিশেষ সংখ্যা যদি বেরোয়, তার জন্য গ্রাহকদের কোনও বাড়তি চাঁদা দিতে হবে না)। আশা করি, উৎস মানুষ-এর সহযোগী, শুভানুধ্যায়ী পাঠকবন্ধুরা সহমর্মিতার সঙ্গে বিষয়টি বুঝবেন।**

## ড. নন্দ ঘোষের চেম্বার

# টিউমার নিয়ে ধুন্ধুমার

### সৌম্যকান্তি পণ্ডা

চেম্বার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। স্যারের বন্ধু অবিনাশবাবুও এসে গেছেন। অবিনাশবাবু স্থানীয় স্কুলে কেমিস্ট্রির শিক্ষক। স্যার আর অবিনাশবাবু অভিন্নহৃদয় বন্ধু। রোজ আড্ডা না দিলে দুজনের কারোরই ভাত হজম হয় না। যদিও এখন করোনার জন্য আড্ডা বন্ধ। অবিনাশবাবু ছেলেকে দেখাবেন বলে এসেছেন। আমরা স্যারের জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে রাখছি। স্যার গ্লাভস, মাস্ক খুলতে যাবেন এমন সময় এক ভদ্রমহিলা মেয়েকে নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে স্যারের চেম্বারে এলেন।

—দেখুন না স্যার, মেয়েটার আজ তিনদিন খুব জ্বর। গলাটা ব্যথা বলছে।

ডা. ঘোষ গলার ভেতরে টর্চ দিয়ে দেখলেন। তারপর গলার চারদিকে টিপেটুপে কীসব দেখে, বাচ্চার বুকে স্টেথো বসালেন। মায়ের দিকে ঘুরে বললেন —হুঁ, গলাতে বেশ ইনফেকশন হয়েছে। গ্ল্যান্ডগুলোও বেশ ফুলেছে দেখছি। ওষুধগুলো ঠিকঠাক খাওয়ান। গরম জলে গার্গল করান। আর একটু গরম জলের ভাপ নাক-মুখ দিয়ে টানাবেন। মাঝে বাড়াবাড়ি না হলে সপ্তাহ দুয়েক বাদে একবার দেখিয়ে যাবেন।

—ঠিক হয়ে যাবে তো স্যার?

—হয়ে যাওয়া তো উচিত, তারপর দেখা যাক — না কমলে আর একবার দেখিয়ে নেবেন, কেমন?

ভদ্রমহিলা চলে গেলেন। স্যার অবিনাশবাবুকে ডাকলেন— কই রে অবিনাশ, আয় বুবুনকে দেখি।

—দ্যাখ না, মাথার পেছন দিকে কেমন টিউমারের মতো হয়েছে। তুই তো বললে এক্ষুনি চেঁচামেচি করবি কিন্তু দ্যাখ, ওকে মাস ছয়েক আগে হোমিওপ্যাথি খাইয়েছিলাম। হোমিওপ্যাথি খাইয়ে টিউমারগুলো অনেক কমে গেছিল। তারপর এখন আবার বেড়েছে। তাই ভাবলাম..

—তাই ভাবলি এবার বিষাক্ত মডার্ন মেডিসিন খাওয়ানো যাক। (দুজনেই একসাথে হেসে উঠলেন)

—তুই ভালো করে দ্যাখ তো, সবসময় ইয়ার্কি করলে দেবো একখানা। (অবিনাশবাবু ছদ্ম রাগে চোখ গোল গোল করলেন)

ডা. ঘোষ ভালো করে মাথার পেছনে গোল্লাগুলো টিপে দেখলেন। তারপর বুবুনের চুলে বিলি কাটতে কাটতে বললেন,

—শেষ ছ'মাসে বাড়িতে কটা শ্যাম্পু কিনেছিস?

—মানে? দ্যাখ, আমি কিন্তু —ইয়ার্কি করছি না। সিরিয়াসলি বল।

—তা একটু বেশিই কিনতে হয়েছে। বুবুনের মাথায় খুব খুশকি হচ্ছে তো।

—দ্যাটস ইট ডিয়ার। দ্যাটস দ্য কজ।

—কী যে বলছিস, মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বুঝলাম না।

- বুবুনের মাথায় যেগুলো হয়েছে ওগুলো টিউমার নয়, লিম্ফ নোড। লসিকা গ্রন্থি। ওই যে আগের ভদ্রমহিলার মেয়ের গলায় যেমন হয়েছে, বুবুনেরও তেমনি। শরীরে এরকম ৫০০-৬০০ মতো লিম্ফ নোড থাকে। মূলত গলা, বগল আর কুঁচকির কাছে। বিভিন্ন কারণে লিম্ফ নোডগুলো ফুলে যায়।

—ও, তাই নাকি? কিন্তু তার সাথে শ্যাম্পুর কী সম্পর্ক?

—সম্পর্ক হ্যাজ ডিয়ার। সম্পর্ক হ্যাজ। বুবুনের মাথায় খুশকির মতো চামড়ার ইনফেকশন হয়েছে। চামড়ার

ইনফেকশন থেকে মাথার পেছনের লিম্ফ নোডগুলো ফুলেছে। বারবার শ্যাম্পু করানোর ফলে চামড়ার ইনফেকশন একটু কমে যেতে লিম্ফ নোডগুলোও ছোট হয়ে গেছিল।

—ও। তাই নাকি? তাহলে হোমিওপ্যাথিতে কোনও কাজ হয়নি বলছিস? আসল জিনিস শ্যাম্পুটাই?

ডা. ঘোষ উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে মুচকি হাসলেন।

—তা বলে তুই যেভাবে বলিস হোমিওপ্যাথি ওরকম নয়। অনেকেরই কাজ হয়।

—বুবুনের ক্ষেত্রে তোর ভুল না ধরিয়ে দিলে তুইও তাই ভাবতিস। শোন, বিজ্ঞানে প্রমাণটাই বড় কথা। প্রমাণ ছাড়া..

—আজ বাদে কাল প্রমাণ হয়ে যায় যদি— তখন তুই কী বলবি?

—মেনে নেবো। বিজ্ঞান তো কোনো কিছু অন্ধভাবে গ্রহণ না করতেই শেখায়। তবে তার আগে তো প্রমাণটা দরকার.. নইলে, আমি যদি বলি পাথর ধারণও অপ্রমাণিত বিজ্ঞান? আজ প্রমাণ হয়নি, কাল হয়ে যাবে?

- তুই কিন্তু এবার এঁড়ে তর্ক করছিস! কোথায় পাথর আর কোথায়...

—আচ্ছা। তোকে উদাহরণটা সহজ করে দিই। ধর, করোনার ভ্যাক্সিন। সারা বিশ্বে বিভিন্নরকম ট্রায়াল চলছে। তাই তো?

—হ্যাঁ, সে তো বটেই..

—এবার ধর সম্পূর্ণ প্রমাণ না আসার আগেই যদি আমি সাধারণ জনগণকে ওই ভ্যাক্সিন দিতে শুরু করে দিই, তুই রাজি হবি?

—না। অবভিয়াসলি না। সে প্রশ্ন আসছে কেন?

—এবার তুই তোর নিজের প্রশ্নে ফিরে যা। প্রমাণ পাওয়া যায়নি এমন জিনিস বুবুনকে খাওয়াচ্ছিস কেন? যেখানে পৃথিবীর বহু উন্নত দেশে প্রমাণের অভাবে একে বাতিলের খাতায় ফেলে দিয়েছে?

—তোর সাথে কথায়...

—শোন, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে একটি রাসায়নিককে 'ওষুধ' হতে গেলে তার সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত ফার্মাকোলজি, কার্যপদ্ধতি, নিষ্ক্রমণ, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ইত্যাদি জানতেই হবে। সে এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া। এর মধ্যে কোথাও সামান্যতম সন্দেহ এলে ওষুধ 'বাতিল' বলে গণ্য করা হয়। এমনকি বাজারজাত হওয়ার পরেও। কারণ, সব দীর্ঘকালীন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া প্রথমেই বোঝা যায় না। বুঝলি?

—হুঁ, বুঝলাম।

—না। আসল কথাটা এখনও বলা হয়নি, আমাদের চোখের দেখাই শেষ কথা নয়। কাক এল আর বেল পড়ল — তার মানে এই নয় কাকটাই বেল পড়ার কারণ। এই কার্যকারণ প্রমাণের নির্দিষ্ট মাপকাঠি আছে। যে কোনও রাসায়নিককে 'ওষুধ' বলতে গেলে ওই মাপকাঠি দ্বারা প্রমাণ করতে হয়। ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি অনেক সময়েই আমাদের ভুল বোঝায়। সেই ভুল বোঝানোকে সম্বল করেই 'ম্যাজিক' দেখানো হয়। যা আপাতদৃষ্টিতে দেখলে সত্যি মনে হয় কিন্তু বিষয়ের গভীরে ঢুকলে দেখা যায় ব্যাপারটা অন্যরকম। তাই 'আমি দেখেছি আমার ওমুক রোগ উলুখাগড়া খেয়ে সেরে গেছিল' বলে উলুখাগড়া 'ওষুধ' হয়ে যায় না। বিজ্ঞানের চোখে কারো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কোনও দাম নেই। সত্য সন্ধানের পথটা বরাবরই কঠোর।

- আচ্ছা ধর, কোনোদিন দেখা গেল আমাদের এসব বিজ্ঞান-টিজ্ঞান সব ভুল। হোমিওপ্যাথিই ঠিক। তখন?

—সেদিন আমিও হোমিওপ্যাথি পড়ে ওসব ওষুধই লিখবো। পরিবর্তনশীলতাই বিজ্ঞান। তবে তার আগে একটু অভিঘাতটা ভেবে নে। অ্যাভোগাড্রো ভুল, অণুবিদ্যা ভুল, কম্পিউটার ভুল, স্যাটেলাইট ভুল, অ্যাটমবোম ভুল, হিরোশিমা-নাগাসাকি ভুল, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ...

—ওরে ভাই, তুই একটু থাম রে বাবা। চ, চ ওঠ.. বুবুনের ওষুধ লিখে দে। দু'টো বাজে। স্নান করে মাথাটা ঠান্ডা কর।

দুজনে আবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন।

উমা

**ভুল সংশোধন : গত সংখ্যার ৩ পাতার ৪ নম্বর লাইনে হরিনাভি ব্লক আছে। সেটা হবে হরিণঘাটা ব্লক।**

**এই সংখ্যায় চিঠিপত্র বিভাগ দেওয়া গেল না। পরবর্তী সংখ্যা বেরোবে জানুয়ারি ২০২১-এ। নির্বাচিত প্রতিবেদনগুলো সেই সংখ্যায় অবশ্যই থাকবে।**

# হোমিওপ্যাথি-ইতিহাস ভবিষ্যৎ ও আমাদের কর্তব্য

অর্ক বৈরাগ্য

**ভূমিকা**

হোমিওপ্যাথি নিয়ে লেখালেখি বাংলা ভাষায় কম নয়। সেভাবে বলতে গেলে হোমিওপ্যাথিতে রোগ সারে কিনা, হোমিওপ্যাথি বিজ্ঞান কিনা এগুলো নিয়ে আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি যতটা পুরনো বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, বাস্তবে তা আরো অনেক বেশি পুরনো এবং অসংখ্য তথ্যনিষ্ঠ, যুক্তিশীল ও সম্ভ্রম-জাগানো লেখালেখিতে পূর্ণ।

বাস্তবে এই আলোচনা তথা বিতর্ক গুলো এক-একটি দেশ বা কালে এক-একটি নির্দিষ্ট জনসংখ্যার মধ্যে হোমিওপ্যাথির গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। ফলস্বরূপ যে সময়ে/স্থানে হোমিওপ্যাথির জনপ্রিয়তা কম থেকেছে, সেই সময়ে/স্থানে তা নিয়ে আলোচনাও খুব কম হয়েছে। বর্তমান সময়ে নতুন করে হোমিওপ্যাথি নিয়ে আলোচনা বা লেখালেখি প্রকারান্তরে জনমানসে তার বেড়ে চলা জনপ্রিয়তাকেই নির্দেশ করে।

হোমিওপ্যাথিকে জানতে ও বুঝতে গেলে তাকে একসাথে অনেকগুলি আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন অথচ পারস্পরিকভাবে সম্পৃক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা ভীষণভাবে প্রয়োজন। একমাত্র এই বহুমাত্রিক অ্যাপ্রোচেই হোমিওপ্যাথির একটি সার্বিক ও সম্পূর্ণ পর্যালোচনা করা সম্ভব। দৃষ্টিকোণগুলি হল —

১। ঐতিহাসিক

২। বৈজ্ঞানিক

৩। আর্থ-সামাজিক ও ভৌগোলিক

৪। স্থানীয় ও আন্তর্জাতীয় রাজনৈতিক

৫। আধ্যাত্মিক ও ধার্মিক

১৭৯০ সালে জার্মান চিকিৎসক স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথির তত্ত্ব ও চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কারের সময় থেকে আজ ২০২০ সাল পর্যন্ত (প্রায় ২৩০ বছর) হোমিওপ্যাথি নানান ওঠা-পড়ার মধ্যে দিয়ে গেছে,তারই সাথে বিভিন্ন চিকিৎসক, বিভিন্ন দেশ এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে দিয়েও গেছে।

এই প্রতিটি ফ্যাক্টরকে মাথায় রেখে, নৈর্ব্যক্তিক ভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করলে অনেকগুলি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে। যেমন :

১। হোমিওপ্যাথি কি বিজ্ঞান?

২। রোগের চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথি কি কার্যকর? হ্যাঁ বা না হলে কেন?

৩। হোমিওপ্যাথি কার্যকর না হলে তা এত দেশের মানুষের কাছে এত জনপ্রিয় কেন? দিনে দিনে সেই জনপ্রিয়তা বাড়ছে কেন?

৪। হোমিওপ্যাথি বিজ্ঞান না হলে বা কার্যকর না হলে বিভিন্ন রাষ্ট্র তাকে অনুমতি দিচ্ছে কেন?

৫। উত্তরোত্তর হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল খুলে সরকারি অনুদানে সেখানে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক তৈরি করা হচ্ছে কেন?

৬। অতীতে ও বর্তমানে একাধিক 'এলোপ্যাথি' চিকিৎসক হোমিওপ্যাথিতে ঝুঁকেছেন কেন ও সেই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করেছেন কেন? এবং সর্বশেষ যে প্রশ্নটির উত্তরের খোঁজে এই লেখার অবতারণা —

৭। ভারতবর্ষে তথা সমগ্র বিশ্বে হোমিওপ্যাথির সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ কী? এবং সেই প্রেক্ষিতে বর্তমান 'মডার্ন মেডিসিনের' চিকিৎসকদের তথা যে কোনো সচেতন, শিক্ষিত, বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের কর্তব্য কী?

এক এক করে উত্তরগুলি পেতে আমরা হোমিওপ্যাথিকে কতকগুলি সময়-কালে (টাইমলাইন) ভেঙ্গে নেব।

১। প্রাক-হ্যানিম্যান সময়কাল (১৬৬০-১৭৫৫)

২। হ্যানিম্যানের সময়কাল (১৭৫৫-১৮৪৩)

৩। হ্যানিম্যান পরবর্তী হোমিওপ্যাথির উত্থান ও 'হিরোইক মেডিসিন' (১৮৪৩-১৯০২)

৪। আধুনিক মেডিসিনের উত্থান ও হোমিওপ্যাথির পতন (১৮৯০-১৯৭০)

৫। হোমিওপ্যাথির পুনরুত্থান ও বর্তমান সময় (১৯৭০-২০২০)

**প্রাক-হ্যানিম্যান সময়-কাল (১৬৬০-১৭৫৫)**

হ্যানিম্যান হোমিওপ্যাথি শব্দের প্রবক্তা। তিনিই প্রথম হোমিওপ্যাথির তত্ত্বগুলি নির্দেশ করেন এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতির প্রচলন করেন। কিন্তু হোমিওপ্যাথির আবিষ্কারের পিছনে যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করেছিল সেটি হল — ভাইটালিজম-তথা ভাইটাল ফোর্স-এর ধারণা।[১] হ্যানিম্যান এই ভাইটালিজম দর্শনের গুণগ্রাহী ছিলেন। যে সমস্ত দার্শনিক এই ভাইটালিজমকে প্রবর্তন করেন ও তাদের রূপরেখা নির্মাণ করেন তাদের মধ্যে মুখ্য হলেন — জর্জ আর্নস্ট স্টাহল (১৬৬০-১৭৩৪), অ্যালবার্ট ভন হেলার (১৭০৮-১৭৭৭) এবং মারি ফ্রাঙ্কো জেভিয়ার বিচাট (১৭৭১-১৮০২)।[১] ভাইটালিজমের মূল বক্তব্য ছিল, জড় ও জীবের মধ্যে গঠনগত উপাদান হিসেবে একই উপাদান থাকলেও জীবের মধ্যে অতিরিক্ত উপাদান হিসেবে থাকে প্রাণশক্তি বা ভাইটাল ফোর্স। এই ভাইটাল ফোর্স কোনো পরিমাপযোগ্য বস্তু নয়, এটি যে কোনো জীবন্ত শরীরের একদম ভিতরের অন্তর্নিহিত একটি উপাদান যার অবর্তমানে জীবটি/মানুষটির পক্ষে আর বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।[১] ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে ভাইটালিজমের আবির্ভাব সেই সময়ে হয়েছে যখন শরীরের মধ্যে জৈবিক ক্রিয়াকলাপগুলির যথাযথ ব্যাখ্যা (যা আজকের সময়ে এসে অনেকটাই জানা) জানা ছিল না, এবং সেই সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ও পর্যবেক্ষণের অবকাশও ছিলনা। ফলস্বরূপ দার্শনিক উপায়ে সেগুলির ব্যাখ্যা দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন ভাইটালিস্টরা। এখানে খেয়াল করা যেতে পারে তাদের বর্ণিত ভাইটাল ফোর্সের সাথে আধ্যাত্মিক পথের 'আত্মা'-র ধারণার আশ্চর্য মিল।

অন্যদিকে একইসাথে জৈবিক ক্রিয়াকলাপগুলিকে ব্যাখ্যা করার জন্যে আরেক ধরনের দর্শনের কথা বলেন রেনে দেকার্তে (১৫৯৬-১৬৫০), ফ্রাঙ্কো ম্যাজেন্ডাই (১৭৮৩-১৮৫৫), ও তাঁর ছাত্র ক্লড বার্নার্ড (১৮১৩-১৮৭৮) এবং আরো অনেকে যা হল মেকানিজম।[১] ধীরে ধীরে মেকানিজমের তত্ত্বগুলির সাথে আধুনিক পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, বিবর্তনতত্ত্ব ও গণিতের তত্ত্বগুলির সাযুজ্য প্রমাণিত হতে থাকে। সে আলোচনায় আমরা আবার ফিরবো।

**হ্যানিম্যানের সময়কাল (১৭৫৫-১৮৪৩)**

হ্যানিম্যান ১৭৫৫ সালে জার্মানিতে জন্মগ্রহন করেন।[২] প্রাথমিক জীবনে তিনি সেই সময়ের প্রচলিত চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করেন কিন্তু দ্রুত উপলব্ধি করেন ও লেখেন — "রোগের সম্বন্ধে ভালো করে না বুঝে, চিকিৎসা পদ্ধতি/ওষুধগুলির ভাল-মন্দ না বুঝে আমার পক্ষে চিকিৎসা করে যাওয়া সম্ভব নয়। এই ভাবে চিকিৎসা করে মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার কথা ভাবলেই আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়ছি।"[২] শেষ পর্যন্ত তিনি প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি ত্যাগ করেন ও রসায়ন চর্চা এবং লেখালেখিতে মনোনিবেশ করেন।[২] এখানে বলা বাহুল্য হ্যানিম্যান তৎকালীন যে চিকিৎসা পদ্ধতিগুলি দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন সেগুলি আধুনিককালের অ্যান্টিবায়োটিক নয়, প্যারাসিটামল, রাইনট্যাক নয়, অজ্ঞান করে ১৫ মিনিটে গল-ব্লাডার অপারেশন নয়, এমআর আই বা সিটি স্ক্যান নয়, যেগুলি বর্তমান সময়ে তর্কাতীতভাবে লক্ষ-কোটি মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে, বরং তিনি যেগুলি দেখে আতঙ্কিত হয়ে ছিলেন সেগুলি বহু আগেই আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা থেকে বাদ গেছে যথা শিরা কেটে প্রচুর পরিমাণে রক্ত বের করে দেওয়া (ব্লাড লেটিং), বিভিন্ন ধাতুর লবণ, উদ্ভিজ্জ পদার্থ (বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যেগুলি ওষুধ কম আর বিষ বেশি ছিল) ব্যবহার করে বমি করানো, পায়খানা করানো, প্রস্রাব করানো ইত্যাদি।

হ্যানিম্যানের সময়কাল এবং তার পরবর্তী আরো কয়েক দশক জুড়ে প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থায় চিকিৎসকরা রোগের কার্য-কারণ সম্পর্ক সম্বন্ধে অনেকাংশেই অজ্ঞাত ছিলেন। ওষুধ হিসেবে যা দেওয়ার চল ছিল, তারও কার্যকারিতা, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক ধারণা তাঁদের ছিল না। মূলত জার্ম থিওরি, অ্যানেস্থেসিয়া, অনুবীক্ষণ যন্ত্র এবং অ্যান্টিবায়োটিকের আবিষ্কার এবং তার সাথে জৈবিক ক্রিয়াকলাপগুলির ব্যাখায় আধুনিক পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীববিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ অবদানের ফলশ্রুতি হিসেবেই প্রচলিত চিকিৎসাবিদ্যার বিজ্ঞানসম্মত আধুনিকীকরণ সম্ভব হয়।

তাই হ্যানিম্যান যে সময়ে দাঁড়িয়ে প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থার অসাড়তার বিরুদ্ধে হোমিওপ্যাথির খোঁজ করেছিলেন তা বাস্তবিকই যুগান্তকারী তথা সেই সময়ের নিরিখে বিজ্ঞানসম্মত ও মানবিক ছিল। চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাসে এই সন্ধিক্ষণে হ্যানিম্যান স্বমহিমায় উজ্জ্বল। আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যার জনক স্যর উইলয়াম অসলার (১৮৪৯-১৯১৯) হ্যানিম্যান প্রসঙ্গে বলেছেন- "চিকিৎসা

শাস্ত্রের পক্ষে হ্যানিম্যান যে পরিমাণ মঙ্গল সাধন করেছেন তা আর কেউ করেন নি।"[৩]

**হ্যানিম্যান পরবর্তী হোমিওপ্যাথির উত্থান ও 'হিরোইক মেডিসিন' (১৮৪৩-১৯০২)**

হ্যানিম্যান ও তার পরবর্তী হোমিওপ্যথির চিকিৎসকরা হোমিওপ্যাথিকে একটি নতুন চিকিৎসাবিদ্যা (নিউ মেডিসিন) তথা নতুন বিজ্ঞান বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাদের কাছে প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল — গোঁড়া, পুরনো ও ভ্রান্ত। এটিকেই বিজ্ঞানের ইতিহাসবিদরা কখনো কখনো হিরোইক মেডিসিনও[৪] বলেছেন, তার কারণ রোগের কার্যকারণ তথা ওষুধের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে যথার্থ বোঝাপড়া ছাড়াই প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থার চিকিৎসকরা তখন 'নায়কোচিত' ভঙ্গিমায় চিকিৎসা করতেন।

এখানে সেই সময়ের হোমিওপ্যাথির দর্শন ও বাংলাতে তথা ইউরোপ-আমেরিকায় সেটি নিয়ে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হোমিওপ্যাথির গুণগ্রাহী চিকিৎসকের হোমিওপ্যাথিতে অবদান নিয়ে খানিক আলোচনা প্রয়োজন।

হ্যানিম্যান ও তাঁর পরবর্তী হোমিওপ্যাথির চিকিৎসকরা বারংবার হোমিওপ্যাথিকে বিজ্ঞানসম্মত ও তার চিকিৎসা প্রণালীকে প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থার তুলনায় শ্রেয় বলে বিচার ও প্রচার করেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য চিকিৎসকরা হলেন — আমেরিকান চিকিৎসক জেমস টাইলার কেন্ট (১৮৪৯-১৯১৬), ব্রিটিশ চিকিৎসক জন এপস (১৮০৫-১৮৬৯), বাঙালি চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকার (১৮৩৩-১৯০৪) প্রমুখ।

কেন্ট তাঁর 'লেকচারস অন হোমিওপ্যাথিক ফিলজফি' বইতে (১৯০০) বলেছেন- "হ্যানিম্যান একটি বিশ্বজনীন সত্য আবিষ্কার করেছিলেন। এমন সত্য যা 'বিজ্ঞানের' ওপর প্রতিষ্ঠিত। যেখানে ব্যক্তিগত মতামতের কোনো গুরুত্ব নেই, ব্যক্তির অভিজ্ঞতার কোনো ভিত্তি নেই। রোগের উৎস, গতি-প্রকৃতি ও ধরণ যেখানে অনুধাবন করা গেছে ও যেখানে যথার্থ নিরাময়কারী বস্তুর খোঁজ পাওয়া গেছে।"[৫]

মহেন্দ্রলাল সরকার তার 'হ্যানিম্যান : চিকিৎসা শাস্ত্রের ইতিহাসে তাঁর স্থান' শীর্ষক প্রবন্ধে (১৮৮২) লিখেছেন — "গুরুত্ব ও গভীরতার বিচারে হ্যানিম্যানের আবিষ্কার সর্বাধিক কল্যাণকারী ও গৌরবময়। ভবিষ্যতে বিজ্ঞান গবেষণা যেদিকেই যাক না কেন, তা হ্যানিম্যানের নির্দেশ করা দিকেই হবে। হোমিওপ্যাথির লঘুদ্রবণের সূত্রই আগামী দিনের চিকিৎসা-ব্যবস্থার স্তম্ভ হয়ে উঠবে।"[৬]

১৮৬০-৯০ সালের মধ্যে বঙ্গদেশে একাধিক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের চেষ্টায় বাংলা ভাষায় একাধিক হোমিওপ্যাথি জার্নাল প্রকাশিত হতে থাকে। সেখানে একইসাথে হোমিওপ্যাথি ও অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসকেরা নিজ নিজ চিকিৎসা ব্যবস্থার স্বপক্ষে যুক্তি সাজাতে থাকেন। এই দ্বিপাক্ষিক যুক্তি-তর্ক ও আলোচনার মধ্যে দিয়েই এই দুই চিকিৎসা শাস্ত্র বঙ্গদেশে একটি সুনির্দিষ্ট অবয়ব লাভ করে; তাদের মধ্যেকার দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পার্থক্যগুলি ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'চিকিৎসা সম্মেলনী', 'চিকিৎসক ও সমালোচক', 'হ্যানিম্যান', 'অণুবীক্ষণ' এরকমই কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জার্নাল/পত্রিকা।[৬]

খুব সহজ করে বললে, বিজ্ঞান হল তাই যা কিনা আমাদের সত্যের সন্ধান দেয়। এর জন্যে আমাদের কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। যেমন — পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, সিদ্ধান্ত। তারই সাথে "কাকে আমরা সত্য বলব?" বা "কীভাবে আমরা সত্যকে জানতে পারি?" এ বিষয়েও কিছু দার্শনিক তথা যুক্তিবাদী (লজিক্যাল) উপায় আমাদের গ্রহণ করতে হয়। সমগ্র দার্শনিক দিকটি (এপিস্টেমোলজি) এই আলোচনার পরিসরের বাইরে।[৭] তবে সহজ করে বলতে গেলে দুটি উপায়ে তা করা সম্ভব। একটি হল --- অভিজ্ঞতাবাদ (এম্প্রিরিসিজম) আর অন্যটি যুক্তিবাদ (র‍্যাশনালিজম)। এককথায় বলতে গেলে এম্পিরিসিজমের মূল বক্তব্য হল — সত্যকে জানা যায় ইন্দ্রিয়-অনুভূতির সাহায্যে এবং তার সাথে খানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে। এক্ষেত্রে আরোহী (ইন্ডাক্টিভ) যুক্তিকাঠামোর প্রয়োজন পড়ে। অন্যদিকে র‍্যাশনালিজমের মূল বক্তব্য হল, সত্যকে জানতে গেলে দরকার নির্দিষ্ট যৌক্তিক বিশ্লেষণের (লজিক্যাল রিজনিং)। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি প্রায়শই আমাদের ভ্রান্ত করে। তাই তাকে গ্রহণ না করাই শ্রেয়। এক্ষেত্রে অবরোহী (ডিডাকটিভ) যুক্তিকাঠামোর প্রয়োজন পড়ে।[৭]

উনিশ শতকের চিকিৎসাবিদ্যা এই দুই প্রধান দার্শনিক ধারায় বিভক্ত ছিল। যেখানে হোমিওপ্যাথিকে তার প্রবক্তারা একটি অভিজ্ঞতালব্ধ বিজ্ঞান (এম্পিরিক্যাল সায়েন্স) হিসেবে গণ্য করতেন। আর 'অ্যালোপ্যাথি'কে ধরতেন যুক্তিনির্ভর বিজ্ঞান (র‍্যাশনাল সায়েন্স) হিসেবে। তখনকার হিসেবে তাঁরা অভিজ্ঞতালব্ধ বিজ্ঞানকেই চিকিৎসা

বিজ্ঞানের 'সঠিক' সায়েন্স বলে মনে করতেন আর সেই হিসেবেই হোমিওপ্যাথি তাঁদের কাছে ছিল সঠিক বিজ্ঞান।[৬]

কলকাতায় চলে আসা ভিয়েনার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক লিওপোল্ড স্যালজার ১৮৭১ সালে বলেন- "তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জটিলতার থেকে বেরতে হলে আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার উপরেই নির্ভর করতে হবে। চিকিৎসা প্রণালীর যে তত্ত্ব এবং তথ্য আমাদের কাছে রয়েছে তার সবটাই অভিজ্ঞতালব্ধ। একাধিক ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যের ওপর ভর করে আর আরোহী যুক্তিকাঠামোর সাহায্যে সেই বিশেষ সত্যকে লাভ করা সম্ভব যাকে কেন্দ্র করে আমরা আমাদের (হোমিওপ্যাথির ) তত্ত্বকে নির্মাণ করতে পারি।"[৬]

'চিকিৎসা সম্মেলনী' পত্রিকায় কাকে সঠিক বিজ্ঞান বলে বিবেচনা করা হবে সেই তর্ক-বিতর্ক ১৮৮৮ সালে কয়েক মাস ধরে চলেছিল অ্যালোপ্যাথি ডাক্তার পুলিন চন্দ্র সান্যাল ও হোমিওপ্যাথি ডাক্তার হারানাথ রায়ের মধ্যে। সেখানেই হোমিওপ্যাথির সপক্ষে জনৈক ডাক্তার যুক্তি দেন- "যে কোন বিজ্ঞানের দু'টি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল —তার বৈজ্ঞানিক সত্যটি ১) ব্যাপক পরিমাণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ২) একটি অভ্রান্ত সর্বজনীন সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে।" তাঁর মতে (উনিশ শতকের) অ্যালোপ্যাথির মধ্যে এর কোন বৈশিষ্ট্যই ছিল না, অন্যদিকে একমাত্র হোমিওপ্যাথির মধ্যেই এই দুই বৈশিষ্ট্য প্রকট ছিল।[৬]

এখন আমরা দেখব উনিশ শতকের হোমিওপ্যাথির মধ্যে কীভাবে ওই দুই বৈশিষ্ট্য উপস্থিত ছিল। হ্যানিম্যান এবং তাঁর পরবর্তী হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকরা যে 'বৈজ্ঞানিক' পরীক্ষা নিরীক্ষার কথা বলতেন তা হল "প্রুভিং" (Proving)।[৮] এক্ষেত্রে একটি হোমিওপ্যাথিক 'ঔষধি' উপাদান (বেলাডোনা, সিঙ্কোনার ছাল, বিভিন্ন ধাতুর লবণ, বিভিন্ন গাছের পাতা, ছাল, ফুল, মৌমাছি, বিছা প্রভৃতির বিষ, মানুষের চামড়ার ফোঁড়া-র পুঁজ ইত্যাদি)-কে স্বল্প মাত্রায় লঘু করে ১০ বা ২০ জন সুস্থ মানুষকে দেওয়া হয়। এরপর তাঁদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয় সেগুলি খাবার পর তাঁদের মধ্যে যা যা লক্ষণ দেখা দিচ্ছে, তাঁরা শারীরিক ও মানসিকভাবে যা যা পরিবর্তন অনুভব করছেন, সেগুলিকে লিপিবদ্ধ করে রাখতে। এরপর সেই লিপিবদ্ধ করে রাখা কোন লক্ষণ নিয়ে ভবিষ্যতে যখন কোনো ব্যক্তি কোনো হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের কাছে আসবেন তখন তিনি সেই লক্ষণটি আদতে কোন 'ওষুধটি' খাবার জন্যে সুস্থ মানুষের দেহে প্রকাশ পেয়েছিল তা মিলিয়ে দেখবেন এবং সেই 'ওষুধটিই' এবার অত্যন্ত লঘু করে, তাকে ঝাঁকিয়ে 'পোটেনশিয়েট' করে ওই রোগীকে দেবেন। এটিই হল, **সিমিলিয়া সিমলিবাস কিউরেন্টার**,বা সদৃশ-চিকিৎসা-হোমিওপ্যাথির প্রথম সূত্র। আর **পোটেনটাইজেশন** হল হোমিওপ্যাথির দ্বিতীয় সূত্র।[৫]

উনিশ শতকের হোমিওপ্যাথদের মতে 'অ্যালোপ্যাথি' চিকিৎসকরা রোগীকে চিকিৎসা করার আগে এই ধরনের কোনো পরীক্ষা করেন না, তাঁরা আন্দাজ বা অনুমানের ওপর ভর করে, ট্রায়াল অ্যান্ড এরর-এর রাস্তায় একটার পর একটা ওষুধ দিতে থাকেন। আর এতে করে রোগের "আসল" কারণটিকে তাঁরা না বুঝে লক্ষণাত্মক (সিম্পটোম্যাটিক) চিকিৎসা করতে থাকেন। এই হিসেবেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকদের কাছে হোমিওপ্যাথি ছিল একটি পরীক্ষা-পদ্ধতি নির্ভর বিজ্ঞান ভিত্তিক চিকিৎসা।[৬] আর সিমিলিয়া সিমলিবাস কিউরেন্টার, বা সদৃশ-চিকিৎসা হল হোমিওপ্যাথির সর্বজনীন সূত্র। মতবাদগুলির সারাংশ করলে যা দাঁড়ায় তা হল-

| | |
|---|---|
| এম্পিরিসিজম | র‍্যাশনালিজম |
| আরোহী যুক্তিকাঠামো | অবরোহী যুক্তিকাঠামো |
| হোমিওপ্যাথি | অ্যালোপ্যাথি |
| ভাইটালিজম | মেকানিজম |

**আধুনিক মেডিসিনের উত্থান ও হোমিওপ্যাথির পতন (১৮৯০-১৯৭০)**

উনিশ শতকের হোমিওপ্যাথির চিকিৎসকেরা প্রচলিত মেডিসিনের যে যে ভ্রান্ত, অবৈজ্ঞানিক দিকগুলি বারবার তুলে ধরতেন, এই সময় থেকে প্রচলিত মেডিসিন সেই সেই ভুলগুলিকেই আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে এক এক করে শুধরে নিতে থাকে। বস্তুত এই সময় থেকেই আধুনিক পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, গণিত, স্ট্যাটিসটিক্স এর প্রভূত উন্নতি হতে থাকে। একের পর এক যুগান্তকারী তত্ত্ব ও সূত্রের আবিষ্কার হতে থাকে। পদার্থবিদ্যায় কোয়ান্টাম মেকানিক্স, কসমোলজি, পরমাণু তত্ত্ব; রসায়নে ক্রিস্টালোগ্রাফি, পলিমার, কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি; জীববিদ্যায় মলিকুলার বায়োলজি, কোষতত্ত্ব, ক্রোমোজোম, ডি এন এ, জেনেটিক্স — একের পর এক তত্ত্বের আবিষ্কার আধুনিক বিজ্ঞানের রূপরেখাটিই পাল্টে দেয়। এর সাথে কম্পিউটার আবিষ্কার এবং গাণিতিক ও স্ট্যাটিসটিক্যাল ক্যালকুলেশন

এই ধরনের আবিষ্কার তথা তাদের বিজ্ঞানসম্মত যাচাই-পদ্ধতিকে অনেক দ্রুত আর সহজ করে দেয়। ধীরে ধীরে আধুনিক বিজ্ঞানের এই শাখাগুলির মধ্যে একটি যোগসূত্র তথা কোলাবোরেশন তৈরি হয়। আর এই সমস্ত কিছুর ওপর ভর করেই উনিশ শতকের প্রচলিত বিজ্ঞান তথা হ্যানিম্যানের উল্লিখিত 'অ্যালোপ্যাথি' রূপান্তরিত হয় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসাবিদ্যায়। র‍্যাশন্যাল মেডিসিন শৈশব অবস্থা কাটিয়ে হয়ে ওঠে 'এভিডেন্স-বেসড মেডিসিন'। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার তত্ত্ব ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে (ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ, এক্স রে, সি টি স্ক্যান, এম আর আই, হিস্টোপ্যাথোলজি, ডি এন এ, পি সি আর) ধীরে ধীরে আসে জার্ম থিওরি, অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যানেস্থেসিয়া, ইনসুলিন, মাইক্রোবায়োলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, মলিকিউলার বায়োলজি, মেটাবলিজম, জেনেটিক্স, ডি এন এ, ফার্মাকোলজি, আণবিক স্তরে একটি ওষুধের ক্রিয়া-প্রণালী (মেকানিজম অফ অ্যাকশন), ইমিউনোলজি, ট্রান্সফিউশন মেডিসিন এবং আরো অনেক কিছু। একের পর এক পর্দা সরে যেতে থাকে। মানবদেহের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপগুলি যা এতদিন অধরা ছিল তা ধীরে ধীরে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। শতাব্দী প্রাচীন প্রশ্নগুলির উত্তর পেতে শুরু করে আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যা।

১। কোষ কী? কীভাবে কাজ করে?

২। শরীরে কী উপায়ে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলি ঘটে ? তার জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তি কোথা থেকে আসে?

৩। প্রজনন কীভাবে হয়? একটি কোষ থেকে আরেকটি কোষ কীভাবে তৈরি হয়?

৪। কোষ চক্র এবং কোষের জন্ম ও মৃত্যু কীভাবে হয়?

৫। রোগ জীবাণু কীভাবে ছড়ায় ও তাদের থেকে শরীরে রোগ কীভাবে হয়?

৬। ম্যালেরিয়া, টিউবারকুলোসিস, স্মলপক্স, প্লেগ কেন হয়?

৭। ক্যান্সার কী ও কীভাবে হয়?

৮। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কীভাবে তৈরি হয়?

আঠারো আর উনিশ শতক জুড়ে এই প্রশ্নগুলিরই উত্তর খুঁজতে চেয়ে চিকিৎসকরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিলেন। হোমিওপ্যাথিকে অবলম্বন করে একদল এগুলির ব্যাখ্যা হিসেবে ভাইটালিজমের তত্ত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানের উত্থানের আগে যে তত্ত্বকে অস্বীকার করা সহজ ছিলনা মোটেও, কারণ তার মধ্যে ছিল অনেক জটিল প্রশ্নের অনেক সহজ সমাধান। বিশ শতকে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে ভাইটালিজম তত্ত্ব খারিজ হয়ে গেল।[১] কেননা মানবদেহের মৌলিক/ফান্ডামেন্টাল ক্রিয়াকলাপগুলির ব্যাখ্যার প্রয়োজনে ভাইটালিজমের আর কোনো দরকারই থাকল না। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রয়োজনে কার্যত অপাংক্তেয় হয়ে গেল ভাইটালিজম।[১]

পাশাপাশি আরো কিছু অভ্যন্তরীণ কারণের জন্যেও হোমিওপ্যাথি জনপ্রিয়তা হারালো তথা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের সংখ্যা ও গুণগ্রাহীর সংখ্যা সারা পৃথিবী জুড়ে উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে গেল।

১। **ফ্লেক্সনার রিপোর্ট**[৯]- ১৯১০ সালে আমেরিকায় এই রিপোর্ট তৈরি করা হয় সেই দেশে কোন কোন হাসপাতালে হোমিওপ্যাথি পড়ানো হচ্ছে, কতজন হোমিওপ্যাথি পড়ছে, ছাত্র তথা জনসাধারণের মধ্যে হোমিওপ্যাথি নিয়ে জনপ্রিয়তা ও উৎসাহ কেমন রয়েছে এগুলির ওপর। এই রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় সব উত্তরই হোমিওপ্যাথির বিপক্ষে গেছে। এরপর সরকার থেকে আইন করে ধীরে ধীরে আমেরিকার সমস্ত হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজগুলিকে বন্ধ বা তাদের আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যার হাসপাতালে রূপান্তরিত করে দেওয়া হয়। ১৮৯০ সালে আমেরিকায় যেখানে ১০০ হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজে প্রায় ১৫০০০ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ছিলেন সেখানে ১৯২২ সালে আমেরিকায় মাত্র একটি হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ পড়ে থাকে। একশোরও কম সংখ্যক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক পড়ে থাকেন গোটা আমেরিকা জুড়ে।[১০]

২। **হোমিওপ্যাথির চিকিৎসকদের আধুনিক চিকিৎসার প্রতি ঝোঁক** — রোগের কার্য-কারণ সম্পর্কে আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি তথা রোগের নির্ণয় ও চিকিৎসায় অভূতপূর্ব ফলাফল লক্ষ্য করে বহু হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক লাইক কিওর লাইকস ও লঘু মাত্রার তত্ত্ব থেকে সরে আসেন এবং আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা প্র্যাকটিশ করতে শুরু করেন।[১০]

৩। **হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকদের মধ্যে দার্শনিক ও চিকিৎসাপদ্ধতি সংক্রান্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব** --- হ্যানিম্যানের জীবনকালের প্রায় শেষ সময় থেকেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি ও তার দর্শন নিয়ে কিছু প্রচ্ছন্ন মতবিরোধ তৈরি হতে থাকে।[১০] একটি মতে, একজন দক্ষ হোমিওপ্যাথি

চিকিৎসক রোগের প্রকৃত কারণটি রোগীর ভাইটাল ফোর্সের সংবেদনশীলতা ও তার অসামঞ্জস্যতার মধ্যে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন। রোগীর সামগ্রিক ইতিহাস (অর্থাৎ অ্যালোপ্যাথদের মতো শুধু রোগের/ রোগ লক্ষণের ইতিহাসই কেবল নয়, তার সাথে রোগীর মনের হদিস— তিনি কেমন মানুষ, কী খেতে, কোথায় ঘুরতে, কেমন সঙ্গ ভালোবাসেন) নিয়ে সেই মতো রোগের সামগ্রিকতাকে মাথায় রেখে একটি যথার্থ ওষুধ, নির্দিষ্ট লঘুমাত্রায় নির্দিষ্ট দিনের জন্যে দেবেন। এই ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় অত্যন্ত লঘুমাত্রার ওষুধ ব্যবহারের নিদানও রয়েছে।

অন্য একটি মতে অনেক ক্ষেত্রেই প্রথম মতাবলম্বন করে চিকিৎসা করলে রোগীর রোগ-ভোগ সহজে কমতে চায় না, অনেক সময় লাগতে পারে ও সর্বোপরি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় রোগী সন্তুষ্ট হতে পারে না। তাই তাঁদের মতে রোগীর আলাদা আলাদা সিম্পটমের জন্যে আলাদা আলাদা ওষুধ ও সেই ওষুধগুলি সামান্য লঘু করে দেওয়া উচিত।

অনেকক্ষেত্রেই প্রথম মতের চিকিৎসকেরা (হ্যানিম্যানও নিজে তাই ছিলেন) দ্বিতীয় মতের চিকিৎসকদের মেকি-হোমিওপ্যাথ আখ্যা দিয়েছেন।[৫] বিংশ শতকের আধুনিক মেডিসিন এই দুই হোমিওপ্যাথির মতভেদকে অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়।

## হোমিওপ্যাথির পুনরুত্থান ও বর্তমান সময় (১৯৭০-২০২০)

১৯৭০ সালের পর থেকে সমগ্র বিশ্ব জুড়েই আবার হোমিওপ্যাথি নতুন করে জনপ্রিয় হতে থাকে।[১০] নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকা লেখে- ১৯৮১ সালে আমেরিকায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের সংখ্যা ১৯৮২ সালে দ্বিগুণ হয়ে যায়।[১০,১১] ধীরে ধীরে আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ, এবং ভারতবর্ষেও অনেক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক তৈরি হতে থাকেন। শুধু তাই নয় সরকারি অনুদানেও একাধিক দেশে নতুন নতুন হোমিওপ্যাথি কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপিত হয়। ইংল্যান্ডের এন এইচ এসের মধ্যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারতেও আয়ুশ মন্ত্রকের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের মানুষের চিকিৎসার জন্যে হোমিওপ্যাথি —"বিকল্প চিকিৎসার" মোড়কে ব্যবহৃত হতে থাকে। ১৯৯৫ সালে ভারতে 'ইন্ডিয়ান সিস্টেম অফ মেডিসিন অ্যান্ড হোমিওপ্যাথি' স্থাপিত হয়।[১২] ২০০৩ সালে এটি আয়ুষ হিসেবে পুনর্নির্মিত হয়। ২০১৭ সালে 'নীতি আয়োগের' মাধ্যমে ভারতবর্ষে আয়ুষ তথা বিকল্প চিকিৎসাব্যবস্থার বর্তমান ও ভবিষ্যত রূপরেখা তৈরি করা হয়।[১২,১৩]

গত ৫০ বছরে হোমিওপ্যাথি তথা অন্যান্য বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থার পুনরুত্থানের কারণগুলি বহুমাত্রিক।

**ক) মডার্ন মেডিসিন সংক্রান্ত কারণ:**

**১। নন-কমিউনিকেবল রোগের উদ্ভব**[১৪]- বিশ শতকের শুরুর দিকে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান শতাব্দী-প্রাচীন রোগগুলির (সিফিলিস, টিবি, ম্যালেরিয়া, গুটি বসন্ত, প্লেগ, রিউমাটিক ফিভার, টাইফয়েড, গনোরিয়া— সবকটিই সংক্রামক রোগ) বিজ্ঞানসম্মত ও কার্যকর চিকিৎসা করতে দারুণভাবে সফল হয়। এর ফল হিসেবে মানুষের গড় আয়ু ৩৫-৪০ বছর থেকে বেড়ে ৬৫-৭০ বছরে পৌঁছে যায়। (উল্লেখ্য গড় আয়ু বাড়ার পিছনে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি ছাড়াও খাদ্যের উৎপাদন ও বন্টন, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, পরিশ্রুত জল ও উন্নত নিকাশি ব্যবস্থা এই কারণ গুলিও ছিল)[১৪] দ্রুততার সাথে এতটা কার্যকর চিকিৎসা ব্যবস্থা বস্তুত আর বাকি সমস্ত চিকিৎসা ব্যবস্থাকে অপ্রাসঙ্গিক করে দেয় (যারা কিনা গত ৪০-৫০ বছরে আবার নতুন করে বিকল্প চিকিৎসা হিসেবে উঠে এসেছে)। কিন্তু এই সময়ে এসে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এক নতুন ধরনের রোগের সম্মুখীন হয়— নন-কমিউনিকেবল ডিজিজ।

**২। রিস্ক ফ্যাক্টর ও রোগের বহুমাত্রিকতা**- সংক্রামক রোগ কমে যাওয়া ও মানুষের গড় আয়ু বেড়ে যাওয়ার ফলশ্রুতি হিসেবে এক নতুন ধরনের রোগব্যাধির আবির্ভাব হয় যা আঠারো বা উনিশ শতকে একেবারেই বিরল ছিল, তা হল— অসংক্রমণযোগ্য, ক্রনিক রোগ। অন্যদিক থেকে দেখলে এই রোগগুলি মূলত খাদ্যাভ্যাস ও জীবনশৈলীর পরিবর্তনজনিত রোগও বটে। বস্তুত বিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে অফিসে ও বাড়িতে প্রযুক্তিগত স্বয়ংক্রিয়তা ও খাদ্যের প্রাচুর্যের কারণে উন্নত দেশগুলিতে নন-কমিউনিকেবল রোগের প্রাচুর্য বেড়ে যায়। ধীরে ধীরে একই ছবি উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও দেখা যায়, তাদের দেশে অপুষ্টি ও সংক্রমণজনিত ব্যাধির হাতে হাত রেখেই। সুতরাং কেবল একটি মাত্র কারণে এই নন- কমিউনিকেবল রোগগুলি হয় না, সেই কারণে এদেরকে বলা হয় মাল্টি ফ্যাকটোরিয়াল ডিজিজ।

**নন কমিউনিকেবল রোগের বৈশিষ্ট্য হল**[১৫] —

ক) এরা একাধিক রিস্ক ফ্যাক্টরের জন্যে হয়। রিস্ক ফ্যাক্টর এমন একটি ধর্ম যা কোনো ব্যক্তির মধ্যে কেবল একটি সংখ্যায় বা মাত্র কিছু সময়ের জন্যে থাকলে আলোচ্য রোগটি হবার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। অথচ, অনেকগুলি রিস্ক ফ্যাক্টর অনেক দিন/বছর ধরে থাকলে রোগটি হবার সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়। কয়েকটি রিস্ক ফ্যাক্টর হল — লিঙ্গ, বয়স, প্রজাতি, পারিবারিক রোগ, ধূমপান/মদ্যপানের অভ্যেস, শরীর চর্চার অভাব, উচ্চ রক্তচাপ, অতিরিক্ত লবণ/চিনি/তেলসমৃদ্ধ খাদ্যাভ্যাস, স্থূলতা ইত্যাদি।

খ) রিস্ক ফ্যাক্টর থেকে রোগে পরিণত হতে অনেক মাস/বছর লাগে।

গ) অনেক দিন ধরে ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে রোগ লক্ষনগুলি প্রকাশ পায় ও তীব্রতর হয়।

ঘ) রোগগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ক্রনিক রোগে পরিণত হয় ; অর্থাৎ সমূলে তারা শরীর থেকে নিরাময় হয় না। তারা হয় সামান্য বা অনেকখানি রোগলক্ষণ নিয়ে রোগীর শরীরে থেকেই যায়।

কয়েকটি উদাহরণ হল — ডায়াবেটিস, হার্ট ডিজিজ, স্ট্রোক, পার্কিনসন্স ডিজিজ, অটোইমিউন রোগ (রিউমাটয়েড বাত, সোরিয়াসিস) স্কিন এলার্জি, নানান ধরনের ক্যান্সার, অ্যাজমা, সি ও পি ডি ইত্যাদি।

এই ধরনের রোগের কারণ যেমন বহুমাত্রিক, তেমনই এর চিকিৎসাও বহুমাত্রিক। সংক্রামক ব্যাধির মতো কেবল একটি ওষুধ কিছুদিন খেলেই বা একটি ভ্যাকসিন নিলেই এই রোগ ভালো হয়ে যায় না। এর জন্যে রিস্ক ফ্যাক্টর পাল্টাতে হয়, যেমন — খাদ্যাভ্যাস পালটাতে হয়, ধূমপান ছাড়তে হয়, ওজন কমাতে হয়, নিয়মিত শরীরচর্চা করতে হয় আর তার সাথে একাধিক ওষুধ প্রায় সারা জীবন খেতে হয়। মানুষের কাছে মুশকিলটা হয় ঠিক এখানে। এতদিনকার মডার্ন মেডিসিন যা প্রায় 'ম্যাজিকের' মত রোগ নির্ধারণ আর রোগের চিকিৎসা করত; দ্রুত, সম্পূর্ণ মুক্তি মিলত রোগভোগের থেকে সে যেন আর সেই ম্যাজিক দেখাতে পারছে না। বলছে, অনেক দিন ওষুধ খেতে হবে, অনেক নিয়ম পালন করতে হবে এবং তার পরেও রোগ থেকে পুরোপুরি মুক্তি মিলবে না, তবে অনেকাংশে কোনোরকম অসুবিধা ছাড়াই বহুদিন সুস্থ থাকা যাবে। এই দীর্ঘকালব্যাপী চিকিৎসার প্রতি সহজেই ধৈর্যহারা হয়ে পড়ে মানুষ। আর খুঁজতে থাকে 'বিকল্প চিকিৎসা', যে তাকে অনেক সহজে, অনেক দ্রুত মুক্তি দেবে রোগ ভোগের হাত থেকে। আর ঠিক এই সুযোগটিকেই কাজে লাগায় হোমিওপ্যাথি তথা বিকল্প চিকিৎসা। তারা মোটামুটি যা বলেন তা হল — ''জীবনশৈলীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত রোগগুলি কীভাবে প্রতিরোধ করা যায় ইদানিং তা নিয়ে সামগ্রিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার জোর চেষ্টা চলছে। এ ক্ষেত্রে ক্রনিক রোগ, যেসব রোগ ততটা ছোঁয়াচে নয় বা সমগ্র দেহযন্ত্র-সংক্রান্ত রোগগুলির চিকিৎসাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তাঁরা দাবি করেন ক্রনিক রোগের চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথি মডার্ন মেডিসিনের থেকেও বেশি কার্যকর। তাদের কাছে এই ধরনের রোগের জন্যে যথার্থ চিকিৎসা রয়েছে।''[১২]

**৩। ল্যাবরেটরি মেডিসিন এর উদ্ভব ও মানবিক স্পর্শের অনুপস্থিতি** — আঠারো ও উনিশ শতকের প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল "ক্লিনিক্যাল মেডিসিন", যেখানে মূলত রোগীর পাশে বসে রোগের বিবরণ শুনে ও ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় ভিন্ন অন্য কোনো উপায় ছিল না। বিংশ শতকে ও বর্তমানে "মডার্ন মেডিসিন" হল — ল্যাবরেটরি মেডিসিন[১৬] যেখানে রোগ নির্ণয় হয় ল্যাবরেটরিতে, ফলে চিকিৎসককে আর আগের মত রোগীর পাশে অনেক সময় দিতে হয় না। এর ফলে রোগী চিকিৎসা করাতে এসে খুব কম সময় কাটায় তার চিকিৎসকের সাথে আর অনেকটা বেশি সময় কাটায় যন্ত্রপাতি ও মেশিনের সাথে, চিকিৎসা ব্যবস্থার এক বিস্তৃত গোলকধাঁধার মধ্যে, যেখানে মানবিক স্পর্শ অনেকটাই অনুপস্থিত।[১৭] অথচ হ্যানিম্যান থেকে কেন্ট সবাই হোমিওপ্যাথদের বলে গেছেন — 'নিজের ভাবনা চিন্তা আর নিজের ভালোমন্দের অনুভূতির বাইরে একজন মানুষ আর কিছুই না — তাই তাকে সময় দিয়ে তাকে বোঝার চেষ্টা করো।'[৫] — মানবিক দিকগুলির অনুপস্থিতিই বেশ কিছু ক্ষেত্রে মানুষের দৃষ্টি মডার্ন মেডিসিনের থেকে সরিয়ে হোমিওপ্যথির দিকে চালনা করেছে।

**৪। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ**

**ক) পাল্টা সাংস্কৃতিক আন্দোলন** (Counter-Culture Movement)[১৮] — ১৯৬০-৭০ এর দশকে বিশ্বজুড়ে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্র তথা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। প্রকট রাজনৈতিক ময়দান ছাড়াও মানুষ তার গানে, কবিতায়, সংস্কৃতিতে,

যৌনতায়, যাপনে, শিল্পে তার প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা প্রকাশ করতে থাকে। ধনতান্ত্রিক দেশগুলির বিজ্ঞান ও চিকিৎসাও কিন্তু প্রকারান্তরে প্রতিষ্ঠানকেই চিত্রিত করে।[১৮] ফলে মানুষের প্রতিষ্ঠান-বিরোধী মন প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ও তার বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে, সে তাকে ছাড়িয়ে অন্য/ বিকল্প চিকিৎসার খোঁজ করতে চায়, যে ব্যবস্থা এই শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার বিকল্প কোনো কিছুর হদিস দেবে। ফলে একটা বড় সংখ্যক মানুষের কাছে হোমিওপ্যাথি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

**খ) প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান বিরোধিতা** — বিশ শতকে পরপর দু'টি বিশ্বযুদ্ধ, পারমাণবিক বোমা, পরিবেশ ধ্বংস, বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস, চের্নোবিল ও ভুপাল গ্যাস দুর্ঘটনা ইত্যাদি নানান ঘটনায় মানুষের মনে প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞানের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম হয়। ফলে যে কোনো ফ্যাক্টরিজাত দ্রব্য, কেমিক্যাল বস্তু এমনকি ওষুধের প্রতিও সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠে ৬০-৭০ দশকের মানুষ। উল্টোদিকে সব কিছুই 'ন্যাচারাল' হলেই একমাত্র ভাল — এই ধারণা গড়ে ওঠে।[১১] সেই জায়গা থেকেই হোমিওপ্যাথি, যার মধ্যে অত্যন্ত লঘু মাত্রায় ওষুধ আছে, যার কোনো 'সাইড এফেক্ট নেই' বলে হোমিওপ্যাথরা প্রচার করেন তার প্রতি মানুষ আকর্ষিত হয়।

**গ) হোমিওপ্যাথি সংক্রান্ত কারণ**

**১। হোমিওপ্যাথির বিগ ফার্মার উত্থান** — ৭০-৮০-র দশকে মানুষের মধ্যে হোমিওপ্যাথি নিয়ে বাড়তে থাকা উৎসাহ ওষুধ ব্যবসায়ীদের চোখ এড়ায়নি।[১১] ওপর থেকে তাঁদের হাতে ছিল আইনি সুবিধেও। ১৯৩৮ সালে যখন আমেরিকায় ফুড ড্রাগ অ্যান্ড কসমেটিক অ্যাক্ট পাশ হয় তখন নিউ ইয়র্কের সেনেটর ছিলেন রয়্যাল কোপল্যাণ্ড, যিনি ১৮৮৯ সালে মিচিগান থেকে হোমিওপ্যাথি পাশ করেন।[১০, ১১] তার তত্ত্বাবধানে এফ ডি এ (ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন— যা ১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়) ফুড ড্রাগ অ্যান্ড কসমেটিক অ্যাক্ট-এর মধ্যে দিয়ে আমেরিকায় প্রস্তুত হোমিওপ্যাথি ওষুধকে 'ওষুধ' হিসেবে তালিকাভুক্ত করে, যাতে অশিক্ষিত, বুজরুকি চিকিৎসার কারবারিরা হোমিওপ্যাথির নামে একাধিক ভেজাল ও ক্ষতিকারক জিনিস মানুষকে দিতে না পারে।[৩২] ১৯৭৭-১৯৮২ সালের মধ্যে আমেরিকান কয়েকটি হোমিওপ্যাথি ওষুধ সংস্থার বিক্রি প্রায় ১০০০ গুণ বেড়ে যায়।[১১]

**২। হোমিওপ্যাথি ওভার-দ্য-কাউন্টার ড্রাগ** — ১৯৮২ সালে এফ ডি এ ১২টি হোমিও ওষুধ কোম্পানির মধ্যে ফিল্ড সার্ভে করে, যাতে একটি আশ্চর্য তথ্য উঠে আসে।[১১] যেখানে হোমিওপ্যাথিতে বলা হয়, একজন দক্ষ, অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকই কেবলমাত্র সঠিক রোগ নির্ণয় করে সঠিক ওষুধ দিতে পারেন, সেখানে ফিল্ড অফিসারেরা দেখেন বেশির ভাগ হোমিও ওষুধ ওভার-দ্য-কাউন্টার ড্রাগ হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ হোমিওপ্যাথিক ফার্মাসিস্টদের বর্তমান হিসেব অনুযায়ী ১০ লক্ষেরও বেশি আমেরিকান হোমিওপ্যাথি খান।[১১]

**৩। হোমিওপ্যাথির হোম-মেড রেসিপি** --- হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক মেসিমান্ড পানোসের (১৯১২-১৯৯৯) লেখা একটি বই হল- 'হোমিওপ্যথিক মেডিসিন অ্যাট হোম' (১৯৮০) যেখানে তিনি লিখেছেন- "পেনিসিলিনের কলঙ্কিত রূপ যখন জানাই গেছে যে সেটি খেলে প্রাণঘাতী অ্যালার্জি হতে পারে, তখন নিজের গলার ইনফেকশনের জন্যে হোমিও ওষুধ বেলাডোনা বাড়িতে বানিয়ে সেবন করুন, যা সম্পূর্ণ পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া মুক্ত।"[১১] বাংলা ভাষাতেও এই ধরনের বইয়ের অভাব নেই, যেখানে বলে দেওয়া আছে বাড়িতে বসে আপনি নিজেই কীভাবে নিজের হোমিওপ্যাথি মতে নানান রোগের চিকিৎসা করতে পারবেন। এই যে — 'সহজেই বাড়িতে নিজেই বানান ও খান'-এর উপায়, এটি অনেক মানুষকেই আত্মমর্যাদা দেয়, তার আত্ম-ক্ষমতায়ন করে, যে কারণে হোমিওপ্যাথি বিশ্বজুড়ে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

সুতরাং বর্তমানে হোমিওপ্যাথির জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে কেবলমাত্র 'সাইড এফেক্ট ছাড়া ওষুধ'-এর বিজ্ঞাপনের আড়ালে হোমিওপ্যাথির "বিগ ফার্মা" আস্তে আস্তে মুনাফার বলে বলীয়ান হয়ে উঠছে। যার সাথে হোমিওপ্যাথির চিকিৎসক বা তার দর্শনের কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ তা দিয়ে লক্ষ-কোটির ব্যবসা হয়না, কিন্তু ওষুধ বেচে হয়।

এবার আমরা আবার আমাদের প্রশ্নগুলির কাছে ফিরি আর দেখার চেষ্টা করি কোন কোন প্রশ্নের উত্তর এখনো অবধি পাওয়া গেছে।

**১। হোমিওপ্যাথি কি বিজ্ঞান?**

উত্তর দেওয়ার আগে কাকে আমরা বিজ্ঞান বলব, বিজ্ঞানের সংজ্ঞা কী সেটা জানা দরকার। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার সংজ্ঞা অনুযায়ী- "Science – any system of

knowledge that is concerned with the physical world and its phenomena and that entails unbiased observations and systematic experimentation. In general, a science involves a pursuit of knowledge covering general truths or the operations of fundamental laws."[১৯]

উনিশ শতকে কোন চিকিৎসা পদ্ধতিকে আমরা বিজ্ঞান সম্মত বলব, তা নিয়ে অনেক বিতর্ক ছিল। কেননা হোমিওপ্যাথি বা 'অ্যালোপ্যাথিকে' যাচাই করার জন্যে আধুনিক পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, গণিত, স্ট্যাটিসটিক্স এর তখনও উন্নতি হয়নি। কিন্তু বিশ শতকের শুরুতে আধুনিক বিজ্ঞানের কষ্টি পাথরে উত্তীর্ণ হল র‍্যাশনালিজম - ডিডাকশনিজম - মেকানিজম তথা 'অ্যালোপ্যাথি'। আমরা যদি আধুনিক পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, গণিত, স্ট্যাটিসটিক্স-এর সূত্র ও সিদ্ধান্তগুলিকে বিজ্ঞান বলে মানি, তাহলে 'অ্যালোপ্যাথি'কেই বিজ্ঞান বলে মানতে হবে। আর হোমিওপ্যাথিকে অবৈজ্ঞানিক। এখানে বুঝতে হবে বিশ শতকে আধুনিক বিজ্ঞান শুধুমাত্র অ্যালোপ্যাথিকে গ্রহণই করেনি, তার সাথে হোমিওপ্যাথিকে নস্যাৎও করেছে। অ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি দর্শন, তাই একটিকে গ্রহণ করা মানেই অন্যটিকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা। যদি কেউ মনে করেন, হোমিওপ্যাথিকে 'বিজ্ঞান' প্রমাণ করার এখনো অবকাশ আছে, তাহলে তাঁকে এমন একটি নতুন বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে হবে, যা আধুনিক পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, গণিত, স্ট্যাটিসটিক্সকে ভুল প্রমাণ করবে।

**২। রোগের চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথি কি কার্যকারী? হ্যাঁ বা না হলে কেন?** — এর জন্যে আমাদের বুঝতে হবে কার্যকরী চিকিৎসা আমারা কাকে বলব? সবচেয়ে বোধগম্য উত্তরটি হল: যে চিকিৎসা আমাকে রোগ হওয়ার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেবে। অর্থাৎ রোগীর শরীরে রোগের না কোন লক্ষণ থাকবে, না রোগের কারণ/ উৎস থাকবে। মুশকিলটা হল বেশির ভাগ অ্যাকিউট রোগের ক্ষেত্রে (ইনফেকশন) রোগের কারণ রোগীর শরীরের বাইরে থেকে আসে, যেমন — ভাইরাস, ব্যাক্টিরিয়া। তাই এই ধরনের রোগের ক্ষেত্রে রোগের উৎসকে সমূলে নিরাময় করা সম্ভব। কিন্তু ক্রনিক রোগের ক্ষেত্রে রিস্ক ফ্যাক্টর অধিকাংশ সময়ে রোগীর মধ্যে প্রথম থেকেই অন্তর্নিহিত থাকে। তাকে রোগীর সাথে আলাদা করা যায়না। যেমন — রোগীর লিঙ্গ, প্রজাতি, বয়স, পারিবারিক রোগ, জিনঘটিত রোগ। তাই ক্রনিক রোগ আর অ্যাকিউট রোগের ক্ষেত্রে কার্যকরী চিকিৎসার সংজ্ঞা আলাদা। ক্রনিক রোগে রোগলক্ষণকে আর রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়াকে আটকে/কমিয়ে রাখাটাই কার্যকরী চিকিৎসা।

এছাড়াও মনে রাখতে হবে মানব সভ্যতায় চিকিৎসাবিদ্যা আসার বহু আগে থেকেই মানুষ পৃথিবীতে রয়েছে। তখনও মানুষের নানা রকম রোগ হত, তাতে অনেকেই মারাও যেত, কিন্তু যারা সুস্থ হয়ে যেত বা বেঁচে যেত তার কেবলমাত্র প্রকৃতির নিয়মে, বিবর্তনের নিয়মেই বেঁচে যেত।[২০] তাই মানুষের বেশ কিছু রোগ কোনোরকম চিকিৎসা ছাড়াই ( তা সে অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদ, আকুপাংচার যাই-ই হোক না কেন) ভাল হয়ে যায়। বস্তুত এটা যে কোনো প্রাণী এমনকি উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও সত্যি। এই সমস্ত রোগের ক্ষেত্রে তাই না বুঝে যে চিকিৎসাই দেওয়া হোক না কেন রোগী ভাল হয়ে যাবেই, আর তার ভ্রান্ত ধারণা হবে যে ওই চিকিৎসা দেওয়ার জন্যেই বুঝি রোগটি ভাল হল। তাহলে এই বিভ্রম থেকে মুক্তির উপায় কী? আশার কথা সেই উত্তরও আধুনিক বিজ্ঞানই দেওয়ার চেষ্টা করে। দুটো আলাদা ঘটনা, তারা কি কেবল 'চান্স'-এর জন্যে একসাথে ঘটল, নাকি তাদের মধ্যে কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক আছে তা জানা যায় স্ট্যাটিসটিক্স কে কাজে লাগিয়ে। বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের রোগ বা চিকিৎসাজনিত যে কোন তথ্য এই স্ট্যাটিসটিক্সকে কাজে লাগিয়ে। বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের রোগ বা চিকিৎসাজনিত যে কোনো তথ্য এই স্ট্যাটিসটিক্সকে ডাবল-ব্লাইণ্ড র‍্যাণ্ডমাইজড কন্ট্রোলড ট্রায়ালের (আর-সি-টি) মাধ্যমে যাচাই করা হয়। হোমিও ওষুধগুলিকেও বেশ কয়েকবার আরসিটি করে পরীক্ষা করা হয়েছে।

২০০০ সালের ট্রায়ালে দেখা যায় — There is some evidence that homeopathic treatments are more effective than placebo; however, the strength of this evidence is low because of the low methodological quality of the trials. **Studies of high methodological quality were more likely to be negative than the lower quality studies**. Further high quality studies are needed to confirm these results.[২১]

২০১৪ সালের আরেকটি ট্রায়ালে দেখা যায় — Medicines prescribed in individualised homeopathy may have smallé– specific treatment effects. Findings are consistent with sub-group data available in a previ-

ous 'global' systematic review. **The low or unclear overall quality of the evidence prompts caution in interpreting the findings**. New high-quality RCT research is necessary to enable more decisive interpretation.[২২]

অ্যাকিউট রোগের ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি যে কার্যকরী নয়, তা সাধারণ মানুষ এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক দুজনেই স্বীকার করে নেন।[১২] ক্রনিক রোগের ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথরা বলেন — তারা রোগের আসল কারণ — ভাইটাল ফোর্সের ভারসাম্যহীনতাকে ঠিক করে, ক্রনিক রোগকেও সমূলে নিরাময় করতে পারেন, তাই তারা আধুনিক চিকিৎসার থেকেও বেশি কার্যকরী।[১২] অন্যদিকে সাধারণ মানুষ রোগভোগে ধৈর্যহারা হয়ে পড়েন ও নিজের জীবন-শৈলীর পরিবর্তন করতে অনিচ্ছুক থাকেন (যা কিনা আসলে তার রোগের কারণ) তাই তারাও মনে করেন ক্রনিক রোগের কার্যকরী চিকিৎসা দিতে 'অ্যালোপাথি' অপারগ, আর হোমিওপ্যাথি সমর্থ। এখানে বলা বাহুল্য আধুনিক পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, গণিত, স্ট্যাটিসটিক্স প্রত্যেকেই "ভাইটাল ফোর্সের" তত্ত্বকে বহু আগেই খারিজ করে দিয়েছে।[১] সুতরাং ভাইটাল ফোর্সকে সত্য প্রমাণিত করে ক্রনিক রোগে হোমিওপ্যাথির কার্যকারিতা প্রমাণ করতে হলে আবার আধুনিক পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, গণিত, স্ট্যাটিসটিক্স কে ভুল প্রমাণ করতে হবে।

তাই অ্যাকিউট বা ক্রনিক কোনো রোগের ক্ষেত্রেই হোমিওপ্যাথিকে প্লাসিবোর থেকে বেশি কার্যকরী বলা যায় না। হোমিওপ্যাথিকে আধুনিক চিকিৎসার থেকেও বেশি কার্যকরী বলা তো আরো বিপদজ্জনক।

**৩। হোমিওপ্যাথি কার্যকরী না হলে তা এত দেশের মানুষের কাছে এত জনপ্রিয় কেন? দিনে দিনে সেই জনপ্রিয়তা বাড়ছে কেন?**

এর উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে।

ক) মডার্ন মেডিসিনের অতিরিক্ত যন্ত্র নির্ভরতা ও মানবিক স্পর্শের ঘাটতি।

খ) মানুষের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান বিরোধী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি।

গ) হোমিওপ্যাথির বিগ ফার্মার উত্থান

ঘ) সহজ লভ্য ওভার দ্য কাউন্টার হোমিওপ্যাথির ওষুধ তথা বাড়িতে বসে নিজে হাতে হোমিওপ্যাথি ওষুধ বানিয়ে নিজের চিকিৎসা নিজে করতে পারার 'ক্ষমতা'।

**৪। হোমিওপ্যাথি বিজ্ঞান না হলে বা কার্যকরী না হলে বিভিন্ন রাষ্ট্র তাকে অনুমতি দিচ্ছে কেন?**

রাষ্ট্র যে সব সময় সব দেশে 'বিজ্ঞানের' খুব কদর করে এই ধরণের ভ্রান্ত ইতিহাসবোধ এড়িয়ে চলাই ভালো। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র অনেক কিছুর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে, যেমন তার উগ্র জাতীয়তাবোধ — যেখানে সে নিজের দেশের মানুষ, নিজের দেশের সংস্কৃতি, নিজের দেশের প্রাচীন বিজ্ঞান ও চিকিৎসা ব্যবস্থাকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। এর উপর ঔপনিবেশিকতা বিরোধী মানসিকতা তো রয়েইছে। ফলে রাষ্ট্রের চোখে 'বিজ্ঞান' সর্বজনীন বা নিরপেক্ষ নয়, তারও জাতীয়তা আছে --- তাই অ্যালোপ্যাথিকে উনিশ শতকে মহেন্দ্রলালরা বলতেন — ইংলিশ মেডিসিন।[৬] হোমিওপ্যাথি ছিল জার্মান মেডিসিন। আয়ুর্বেদ ভারতীয় মেডিসিন।

তাই জার্নাল অফ আয়ুর্বেদ অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিন-এর সম্পাদক লেখেন —The 'New India' also needs to be a 'Healthy India' where its own traditional systems can play a significant role. ...Ministry of AYUSH, represent a pluralistic and integrative scheme of health services. AYUSH can play an important role in realizing the dream of 'New India' by providing quality healthcare and medical care for its citizens.[২৩]

বর্তমান সময়ে আমাদের বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম, বিজ্ঞানচেতনা, মূল্যবোধ, পরিবেশভাবনা, জাতীয়তাবাদ সবই একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি অন্যটিকে বিপুল পরিমাণে প্রভাবিত করে। এক একটি রাষ্ট্র তার জাতীয়তাবাদী, ধর্মীয়, রাজনৈতিক বোঝা-পড়া তথা অবস্থান অনুযায়ী তার বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রকেও বেছে নেয়। হোমিওপ্যাথি তথা আয়ুষ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সেই পরিচয়টিই বহন করে। এর উপর ভর করেই ভারত পৃথিবীর বুকে স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে পরিচিত হতে চায়- "নিউ ইন্ডিয়া" যার পোশাকি নাম।

**৫। উত্তরোত্তর হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল খুলে সরকারি অনুদানে সেখানে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক তৈরি করা হচ্ছে কেন?**

এর পিছনে মডার্ন মেডিসেনের আরেকটি ব্যর্থতা লুকিয়ে আছে। বিশ শতকে আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা শিখে চিকিৎসকরা আবার তাঁর কমিউনিটি/সম্প্রদায়ে ফিরে যেতেন। কখনো তাঁদের বলা হত — পারিবারিক চিকিৎসক,

কখনো বলা হত খালি-পদ ডাক্তার, কখনো বা পাড়ার ডাক্তার। বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির পরে চিকিৎসা ব্যবস্থার দ্রুত বেসরকারিকরণ হতে থাকে। একে একে বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিং হোম গড়ে ওঠে। নানার স্পেশালাইজেশন, সুপার-স্পেশালাইজেশন চলে আসে চিকিৎসা শাস্ত্রে। ধীরে ধীরে গ্রাম থেকে, মফস্বল থেকে হারিয়ে যেতে থাকেন এম বি বি এস পাশ ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানরা।[১৪] এর জন্যে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা যেমন দায়ী তেমনই দায়ী বিশ্ব জুড়ে আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পরিবর্তন ও মুক্ত-বাজার অর্থনীতি আর বেসরকারিকরণ— যার পিছনে রাষ্ট্রের ভূমিকাও সমানভাবে উল্লেখযোগ্য।

কারণ যাই হোক না কেন, ফলস্বরূপ শহুরে, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা আর গ্রামে/মফস্বলে গিয়ে চিকিৎসা করতে চাইলেন না, আর তার কারণ শুধুমাত্র তাঁর ব্যক্তিগত অনীহাই নয়, সরকারি উদ্যোগে গ্রামীন হাসপাতালগুলিতে আধুনিক চিকিৎসা দেবার মত পরিকাঠামো তৈরিরও অভাব।[১৫] এই অবস্থায় আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার চিকিৎসক সেই হাসপাতালকেই বেছে নেবেন যেখানে তিনি তার প্রশিক্ষিত জ্ঞান ও পারদর্শিতাকে কাজে লাগাতে পারবেন অর্থাৎ শহুরে বেসরকারি হাসপাতাল। পরিকাঠামোহীন গ্রামের হাসপাতালে তিনি যাবেন না। কারণ সেখানে আধুনিক চিকিৎসার জন্যে প্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরি নেই, এক্স রে, এম আর আই নেই, নানা রকম কার্যকরী অথচ বিগ ফার্মার নির্ধারণ করে দেওয়া দামি দামি ওষুধ নেই। তাহলে সেখানে যাবেন কে? হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক, আয়ুষ চিকিৎসক। কেননা, তাঁদের চিকিৎসা পদ্ধতি অনুযায়ী চিকিৎসা করার জন্যে সেই ধরনের কোনো পরিকাঠামোই লাগবে না, যা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের চিকিৎসকরা চেয়ে থাকেন। মঞ্জু পিলানিয়া তাঁর "আয়ুষ ইন ইন্ডিয়া" শীর্ষক প্রেজেন্টেশনে তাই লিখেছেন- হোমিওপ্যাথি তথা আয়ুশ চিকিৎসা পদ্ধতিগুলি[১২]-

১. Relatively less resources (manpower and infrastructure) requiring. ২. Relatively cheap. ৩. Don't depend so much on diagnostic tests for treatment.

একদিকে আধুনিক চিকিৎসকের অনীহা তথা আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার এত রকমের ব্যয়বহুল চাহিদা, অন্যদিকে আয়ুষ/হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের উৎসাহ তথা অত্যন্ত কম খরচে, ন্যূনতম পরিকাঠামো নিয়ে 'কোয়ালিটি' চিকিৎসা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি এবং এর মাধ্যমে 'নিউ ইন্ডিয়ার' স্বপ্ন পূরণের অঙ্গীকার- এই অবস্থায় সরকার উত্তরোত্তর হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল খুলে সরকারি অনুদানে সেখানে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক তৈরি করবে এতে আশ্চর্য কী? তবে খটকা লাগে অন্য জায়গায়। সরকার সব দিক বিচার করে নিরুপায় হয়ে আয়ুষ তথা হোমিওপ্যাথিকে মান্যতা দিচ্ছে। নাকি, আয়ুষ তথা হোমিওপ্যাথিকে একদিন মান্যতা দেবার লক্ষ্য মাথায় রেখেই বহু দিন ধরে ধীরে ধীরে শহুরে স্পেশালাইজড চিকিৎসক, শহুরে বেসরকারি হাসপাতাল তৈরি করে, গ্রামীন পরিকাঠামোকে ধীরে ধীরে অকেজো আর আধুনিক চিকিৎসা দেবার অনুপযোগী করে দেওয়া হয়েছে? সংশয় থাকল, উত্তর দেবে আগামী সময়।

**৬। অতীতে ও বর্তমানে একাধিক 'অ্যালোপ্যাথি' চিকিৎসক হোমিওপ্যাথিতে ঝুঁকেছেন কেন ও সেই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করেছেন কেন?**

এর কারণটি মূলত দার্শনিক। অন্যভাবে বললে হোমিওপ্যাথির যে ভাইটালিজম তথা এম্পিরিসিজম-এর দর্শন তার প্রতি অনেক চিকিৎসকই আকর্ষিত হয়েছেন। এই দর্শনের সাথে প্রকৃতপক্ষে জড়িয়ে রয়েছে আধ্যাত্মিকতা তথা ধর্মীয় 'বিশ্বাসব্যবস্থা'। এটিকে বুঝতে হলে আমাদের আধ্যাত্মিক দর্শনের উৎসকে খানিক বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক কেন্ট বলেছেন— "যদিও হোমিওপ্যাথি একটি পার্ফেক্ট সায়েন্স, এর সত্যের কেবল আংশিক উদ্ঘাটন হয়েছে। এই সত্য ঈশ্বরের সাথে সম্পৃক্ত আর তার প্রজ্ঞা মানুষের সাথে। এই সত্যের যথার্থ কান্ডারী হতে একজন (নব্য) চিকিৎসকের অনেক সময় লাগবে।"[৫]

নোবেলজয়ী ফরাসী জীববিজ্ঞানী জ্যাকিস মোনোড (১৯১০-১৯৭৬) তাঁর "চান্স অ্যান্ড নেসেসিটি" প্রবন্ধে (১৯৭০) বিবর্তনের প্রসঙ্গে বলেছেন[১] — 'প্রাণের সৃষ্টি ও বিবর্তন একটি আকস্মিক ঘটনা মাত্র (চান্স)। প্রাণের সৃষ্টির পিছনে কোন সচেতন পরিকল্পনা নেই —এটি একেবারেই বিভিন্ন ভৌত-রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার উদ্দেশ্যহীন ফলাফল মাত্র। তাই যেহেতু মানুষের সৃষ্টির পিছনে প্রকৃতির কোন উদ্দেশ্য নেই, কারোরই এই বিরাট মহাবিশ্বে কোন উপলক্ষ্য (পারপাস) নেই , এবং মানুষের অস্তিত্বের প্রতি এবং মহাবিশ্বের সমস্ত পদার্থের একে অপরের প্রতি সমান উদাসীনতা বর্তমান। এই ধরনের দার্শনিক/বৈজ্ঞানিক

উপলব্ধি আমাদের মনে অপ্রশমিত হতাশা/নাস্তিবাদের (পেসিমিজম) জন্ম দেয়।' তিনি আরও বলেন — 'এই সত্যকে স্বীকার করতে হলে মানুষকে পাপ-পুণ্যের হিসেব থেকে বেরিয়ে আসতে হয় এবং কোনো ভাল কাজ করার পিছনে কোন দৈবিক পুরস্কার অপেক্ষা করে আছে, এই ধারণাকে ভুলে কেবলমাত্র মূল্যবোধ আর নৈতিকতার দায় থেকে কর্ম করে যেতে হয়। এতে করে প্রকৃতপক্ষে মানসিক যন্ত্রণা আরও বাড়ে। সেই ক্ষেত্রে এই যন্ত্রণাকে প্রশমিত করতে পারে একমাত্র এই বোধ যে মানুষ হিসেবে এই বিশ্বে আমার নিশ্চয়ই কিছু মহৎ উদ্দেশ্য এবং উপলক্ষ্য আছেই। (না হলে আমার এই পৃথিবীতে জন্ম হতে যাবে কেন?) কিন্তু এই বোধকে লালন করতে গেলে প্রাণের উৎপত্তি ও মহাবিশ্বে আমার অবস্থানের উদ্দেশ্যকে/ব্যাখ্যাকে শেষমেশ আধ্যাত্মিকতা তথা আত্মার ধারণার সঙ্গে গিয়ে মিশে যেতে হয়। গোটা ইতিহাস জুড়ে সমস্ত ধর্ম, সমস্ত দর্শন, এমনকি 'বিজ্ঞানের' কিছু অংশও মরিয়া হয়ে বারবার আমাদের এই অস্তিত্বের 'আকস্মিক ঘটনা'কে ভুল প্রমাণ করতে চেয়েছে।'[৮]

হোমিওপ্যাথিতে 'ভাইটালিজম'-এর তত্ত্বও ঠিক এই চেষ্টাটিই করেছে।

হ্যানিম্যান তাঁর 'অর্গ্যানন' বইতে (১৮১০) লিখেছেন — "যখন কোন ব্যক্তি অসুস্থ হয়, তখন আসলে এই আধ্যাত্মিক, স্বয়ংক্রিয় এবং অশরীরী (immaterial) ভাইটাল ফোর্স যা সেই ব্যক্তির সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে উপস্থিত রয়েছে, সেটি ভারসাম্যচ্যুত (deranged) হয়..."[৫]

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ইউজিন অস্টিন ১৯১৭ সালে কেন্ট-এর স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেন- "কেন্ট সশ্রদ্ধ চিত্তে, নিষ্ঠার সাথে প্রকৃতি সংক্রান্ত ঈশ্বরের খোলা বইয়ে দৃষ্টি নিমগ্ন করেন। 'সিমিলিয়া সিমলিবাস কিউরেন্টার'-এর যে ঐশ্বরিক সূত্র দিয়ে ঈশ্বর আমাদের পুরস্কৃত করেছেন কেন্ট তার যথোপযুক্ত মর্যাদা দেন।"[৫]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রে 'সিমিলিয়া সিমলিবাস কিউরেন্টার'-এর সূত্র একটি সর্বজনীন, অনন্য ঐশ্বরিক সূত্র, 'ভাইটালিজম' একটি আত্মা তথা আধ্যাত্মিক ধারণা এবং একজন দক্ষ ও সফল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক মাত্রেই এই ঈশ্বর তথা আধ্যাত্মিকতার একনিষ্ঠ সাধক। সেই কারণেই হ্যানিম্যান এবং কেন্ট বারবার বলে গেছেন — হোমিওপ্যাথি একটি সাধনা। খুব কম সংখ্যক ব্যক্তিই অনেক সাধনার পর, অনেক সময় পর হোমিওপ্যাথিকে প্রকৃত অর্থে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। সবাই পারেন না।[৫]

প্যান আমেরিকান স্কুল অফ ন্যাচারাল মেডিসিনের ডিন প্রফেসর চার্লস ম্যাক উইলিয়ামস তাঁর "Is Homeopathy a religion?" শীর্ষক লেখায় মন্তব্য করেছেন — "In conclusion, what we can say about homoeopathy and religion is that there are some definite relations between them. They agree very broadly about the nature of man and of life, they support each other logically and they complement one another".[২৬]

তাই নিজের ব্যক্তিগত যাপনে ও দর্শনে যে সমস্ত ব্যক্তি/চিকিৎসক আধ্যাত্মিকতা তথা পরম কল্যাণময় ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী তারা অবচেতনেই হোমিওপ্যাথির দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন। আধুনিক বিজ্ঞান বা তার ভিত্তির ওপর নির্মিত আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার কঠোর 'বস্তুবাদ', 'খণ্ডতাবাদ' (Reductionism)-কে তিনি আগাগোড়া সংশয়ী মনে দেখেন এবং এটির প্রতি একটি সুপ্ত ঔদাসীন্য নিয়ে চলেন। ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক পড়াশোনা আর যুক্তিবাদী চিন্তা-চেতনার অনুশীলনের অভাবে তিনি ধীরে ধীরে হোমিওপ্যাথিকে যাপনে, দর্শনে ও আধ্যাত্মিকতায় মনেপ্রাণে গ্রহণ করেন। এর সাথে অতিরিক্ত চালিকাশক্তি হিসেবে উনিশ শতকের চিকিৎসকের মনে কাজ করেছিল — 'ব্রিটিশ বিরোধী স্বদেশিকতা' (কারণ অ্যালোপ্যাথি ছিল ব্রিটিশদের চিকিৎসা);[৬] আর বর্তমানে একবিংশ শতকের চিকিৎসকের মনে কাজ করে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে ভারতবর্ষ আর তার নিজস্ব চিকিৎসা 'বিজ্ঞান'কে 'জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন' দেবার জাতীয়তাবাদী বাসনা।

**৭। ভারতবর্ষে তথা সমগ্র বিশ্বে হোমিওপ্যাথির সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ কী? এবং সেই প্রেক্ষিতে বর্তমান 'মডার্ন মেডিসিনের' চিকিৎসকদের তথা যে কোনো সচেতন, শিক্ষিত, বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের কর্তব্য কী?**

এর জন্যে বর্তমানে হোমিওপ্যাথি তথা 'বিকল্প চিকিৎসাব্যবস্থার' স্টেকহোল্ডারদের হোমিওপ্যাথি ও তার কার্যকলাপ সম্পর্কে কী কী ধারণা রয়েছে, তা অনুধাবন করা প্রয়োজন। নীচের টেবিলটিতে তার একটি রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

| স্টেকহোল্ডার | হোমিওপ্যাথির বৈধতা সংক্রান্ত ধারণা |
|---|---|
| রাষ্ট্র | ১) জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা<br>২) অবাধ বৈজ্ঞানিক উন্নতি রাষ্ট্রের দ্বারা ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতার পরিপন্থী— এই ধারণা |

| | |
|---|---|
| হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক | ১) 'অ্যালোপ্যাথির সীমিত ক্ষমতা/বোধগম্যতার বাইরে' পাল্টা তথা উন্নত 'হোমিওপ্যাথিরনিজস্ব বিজ্ঞান' এর ধারণা<br>২) সরকারের পক্ষ থেকে হোমিওপ্যাথি/বিকল্প চিকিৎসার 'গবেষণা', প্রচার ও প্রসারে অনেক উৎসাহ ও ফাণ্ডিং পাওয়া যাবে —এই ধারণা<br>৩) মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা ও তার চর্চার অভাবের সুযোগে মানুষকে হোমিওপ্যাথি ও অন্যান্য 'সিউডো-সায়েন্স'-ই যে প্রকৃত ও উন্নত বিজ্ঞান-তা বোঝানো যায় ও যাবে-এই ধারণা |
| জন সাধারণ | ১) প্রাতিষ্ঠানিক 'বিজ্ঞান ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের' মানুষকে ল্যাবরেটরিতে তৈরি 'কৃত্রিম' রোগের আজীবন রুগী বানিয়ে ও তার ওষুধ বিক্রি করে লক্ষ কোটি মুনাফা লোটার 'চক্রান্তের' ধারণা<br>২) আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান আসলে মুনাফালোভী আগ্রাসী 'চিকিৎসা ব্যবসা' এই ধারণা<br>৩) অবাধ বৈজ্ঞানিক উন্নতি মানুষের ধর্মীয়/আধ্যাত্মিক ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে ( অর্থাৎ, বিজ্ঞান-সর্বস্বতার বিপথগামিতার উল্টোদিকে ধর্মীয়/আধ্যাত্মিক ভাবনাই যে প্রকৃতপক্ষে চরম সত্য/প্রজ্ঞা তথা মোক্ষ লাভের উপায়) এই ধারণা |
| বিগ ফার্মা ও মুক্ত অর্থনীতি | ১) মানুষ জাতীয়তাবাদী, ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক দর্শনের প্রতি বেশি আকর্ষিত এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞানের প্রতি সন্দেহ-প্রবণ ও বীতশ্রদ্ধ- এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে হোমিওপ্যাথি/বিকল্প চিকিৎসার ওষুধ বিক্রি করে অনেকখানি লাভবান হওয়া যাবে-এই ধারণা<br>২) সরকারের পক্ষ থেকে হোমিওপ্যাথি/বিকল্প চিকিৎসার ওষুধ তৈরি ও বিক্রিতে অনেক উৎসাহ ও বানিজ্যিক ছাড়পত্র পাওয়া যাবে-এই ধারণা। |

হোমিওপ্যাথির সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রেডিকশন করতে গেলে আরো কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন। একবিংশ শতকে রাষ্ট্র, অর্থনীতি, রাজনীতি, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম, প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞানচেতনা, সমাজ, পরিবেশভাবনা, আধ্যাত্মিকতা এরা প্রত্যেকে একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এক একটি রাষ্ট্র তার সাথে বিজ্ঞান এবং ধর্মের আনুপাতিক যোগসূত্রের ওপর দাঁড়িয়ে তার রাজনীতি, অর্থনীতি, পরিবেশ ভাবনা, চিকিৎসা ব্যবস্থা নির্ধারণ করে। এই ধরনের একটি রাষ্ট্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সেট নীচের টেবিলে দেওয়া হল।

| ধর্মীয় মৌলবাদ |
|---|
| প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সাথে রাষ্ট্রের পূর্ণমাত্রায় সম্পৃক্তি |
| উগ্র জাতীয়তাবাদ |
| আধুনিক বিজ্ঞান বিরূপতা |
| সাবেকি/প্রাচীন বিজ্ঞান তথা চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি মাত্রাহীন শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ঝোঁক |
| হোমিওপ্যাথি ও অন্যান্য প্রাচীন চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা ও সরকারি বিনিয়োগ, মানুষের জনপ্রিয়তা, বিগ ফার্মার বিনিয়োগ |

ফলত স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে এই আপাত বিচ্ছিন্ন বিষয়গুলি হোমিওপ্যাথির প্রচার, প্রসার ও জনপ্রিয়তার সাথে কীভাবে সম্পর্কিত। গত কয়েক দশক ধরে ভারতবর্ষ তথা গোটা বিশ্ব জুড়ে ধর্মীয় মৌলবাদ, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সাথে রাষ্ট্রের পূর্ণমাত্রায় সম্পৃক্তি, উগ্র জাতীয়তাবাদ, আধুনিক বিজ্ঞান বিরূপতা, সাবেকি/প্রাচীন বিজ্ঞান তথা চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি মাত্রাহীন শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ঝোঁক ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে।[২৭,২৮] (এর কারণ স্বাভাবিকভাবেই এই আলোচনার পরিসরে পড়ে না এবং এর ব্যাখ্যা অন্য কোন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক আলোচনার বিষয় বলেই মনে করছি।) ফলস্বরূপ আগামীদিনে ভারতবর্ষ তথা বিশ্ব যদি এই পথেই এগোতে থাকে তবে ভবিষ্যতে হোমিওপ্যাথি ও অন্যান্য প্রাচীন চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা ও সরকারি বিনিয়োগ, মানুষের জনপ্রিয়তা, বিগ ফার্মার বিনিয়োগ উত্তরোত্তর বাড়বে বলেই ধারণা করা যেতে পারে। আরো বেশি করে হোমিওপ্যাথি কলেজ খুলবে, হোমিওপ্যাথির 'বিজ্ঞান' নিয়ে গবেষণা হবে, হোমিওপ্যাথির কার্যকারিতা নিয়ে প্রচার ও বিভিন্ন

পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি হবে বলেই আশঙ্কা। সেক্ষেত্রে ব্যয় সঙ্কোচনের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে মৌলিক বিজ্ঞানের গবেষণায়[২৯] ও আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবায় সরকারি ফান্ডিং আরো কমে যাওয়ার সম্ভাবনাও ফেলে দেওয়া যায়না।[৩০]

**এই প্রেক্ষিতে বর্তমান 'মডার্ন মেডিসিনের' চিকিৎসকদের কর্তব্য**

১) হোমিওপ্যাথির 'বিজ্ঞানকে' অবজ্ঞার চোখে দেখলেও হোমিওপ্যাথির জনপ্রিয়তা আর রাষ্ট্রের হোমিওপ্যাথির প্রতি পৃষ্ঠপোষকতাকে গুরুত্বের সাথে বিচার করা প্রয়োজন। বর্তমানে বেশির ভাগ রোগী বিশেষত যারা ক্রনিক রোগে ভুগছেন তাঁরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মডার্ন মেডিসিনের চিকিৎসকের কাছে আসার আগে ও পরে হোমিওপ্যাথির (বা অন্যান্য বিকল্প চিকিৎসার ) চিকিৎসা নিচ্ছেন। এতে করে রোগীর রোগের জটিলতা ও রোগভোগ আরও বেড়ে যাচ্ছে। অনেক সময়ই রোগী বড্ড দেরি করে ফেলছেন যখন আর চিকিৎসকের বেশি কিছু করার থাকছে না। শেষমেশ রোগী-চিকিৎসক সম্পর্কেরও অবনতি ঘটছে।

২) রোগীকে রোগ নির্ণয় তথা মানবিক আশ্বাস ও স্পর্শ দেওয়ার খাতিরে আরো বেশি সময় দেওয়া প্রয়োজন। ধীরে ধীরে ধৈর্যের সাথে রোগীর সমস্ত জিজ্ঞাসা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে নিরসন করা প্রয়োজন। এতে করে চিকিৎসা ব্যবস্থার "অন্তর্নিহিত অনিশ্চয়তা" ও "রোগমুক্তির সম্ভাবনা তত্ত্বের" প্রতি রোগীর ও তার পরিবারের আস্থা তৈরি হবে আর তার সাথেই 'রোগীকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা হচ্ছে ও চিকিৎসার নামে মুনাফা লোটা হচ্ছে' —জাতীয় ভ্রান্ত ধারণা ও সেই সংক্রান্ত ক্ষোভ খানিক প্রশমিত হবে। মনে রাখতে হবে একজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক, অন্তত তত্ত্বগতভাবে রোগীকে সামগ্রিকতায় দেখেন ও তার মন বোঝার চেষ্টা করেন।

৩) আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার যে অমানবিক দিকগুলি রাষ্ট্র ও 'বিগ ফার্মার' যোগ-সাজসে[৩১] মানুষের মনে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্বন্ধে স্বাভাবিক অসন্তোষ আর অবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে, নিরন্তর বৈজ্ঞানিক প্রচার তথা সবার জন্যে সমান স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার দাবিতে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার চিকিৎসককে সোচ্চার হতে হবে। এটি ভিন্ন মানুষের মনে বিশ্বাসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা মুশকিল।

**এই প্রেক্ষিতে যে কোনো সচেতন, শিক্ষিত, বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের কর্তব্য কী?**

১) বিজ্ঞান আন্দোলন ও জন-স্বাস্থ্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

২) নিরন্তর নিজের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পড়াশোনা ও বৈজ্ঞানিক চেতনার অনুশীলন চালিয়ে যেতে হবে।

৩) বৈজ্ঞানিক চেতনার প্রচার ও প্রসার চালিয়ে যেতে হবে।

৪) ধর্মীয় মৌলবাদী, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সাথে পূর্ণমাত্রায় সম্পৃক্ত, উগ্র জাতীয়তাবাদী, আধুনিক বিজ্ঞান-বিরূপ রাষ্ট্রের থেকে সরে এসে বিকল্প রাষ্ট্রের নির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।

৫) সচেতন, ওয়াকিবহাল, বিজ্ঞান মনস্ক ও নৈতিক নাগরিক হওয়ার নিরন্তর চেষ্টা করতে হবে আমাদের সকলকে।

**এত কিছুর পরেও কিছু মানুষ থাকবেন যারা বলবেন— "কিন্তু আমি দেখেছি হোমিওপ্যাথিতে কাজ হয়, আমি নিজে উপকার পেয়েছি বা আমার পরিবারের মানুষ উপকার পেয়েছে" — কিন্তু কেন?**

কারণ তারা হোমিওপ্যাথির ধর্মে ধার্মিক। 'ভাইটালিজম' তাঁদের ঈশ্বর। হ্যানিম্যান ও কেন্ট তাঁদের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পূজারী ও সাধক। 'অর্গ্যানন' ও 'মেটেরিয়া মেডিকা' তাঁদের ধর্মগ্রন্থ। হোমিওপ্যাথির লঘু দ্রবণ তাঁদের প্রসাদ। মার্জনা করবেন কিন্তু একটি কথাও বিদ্রূপ করে, ছোট করে দেখানোর জন্যে বলা নয়। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সাথে ও তার ধার্মিকদের সাথে/ধর্মানুসারীদের সাথে হোমিওপ্যাথি বিশ্বাসীদের অনেক আশ্চর্য মিল রয়েছে।[২৬] নীচের টেবিলটি দেখলে স্পষ্ট হবে।

| প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম | হোমিওপ্যাথি |
|---|---|
| ১) ঈশ্বর কে দেখা যায় না কিন্তু তিনি সর্বত্র বিরাজমান | ১) ভাইটাল ফোর্সকে দেখা যায় না, কিন্তু এটি মানব শরীরে সর্বত্র উপস্থিত |
| ২) অনেক সাধনা করলে তবেই ঈশ্বর কে পাওয়া যায়। খুব কম মানুষই তা পারেন। | ২) অনেক সাধনা করলে তবেই হোমিওপ্যাথিকে ভাল করে বোঝা যায়। খুব কম মানুষই তা পারেন। |
| ৩) বিজ্ঞান কি প্রমাণ করতে পারবে ঈশ্বর নেই? | ৩) বিজ্ঞান কি প্রমাণ করতে পারবে ভাইটাল ফোর্স নেই? |
| ৪) বিজ্ঞানের মাপকাঠিই কি একমাত্র নাকি যা দিয়ে ঈশ্বরকে দেখা যাবে? | ৪) বিজ্ঞানের মাপকাঠিই কি একমাত্র নাকি যা দিয়ে ভাইটাল ফোর্সকে দেখা |

| | |
|---|---|
| | যাবে? বা হোমিওপ্যাথিকে প্রমাণ করা যাবে? |
| ৫) বিজ্ঞান কি সব কিছুর উত্তর দিতে পারে নাকি? | ৫) বিজ্ঞান কি সব কিছুর উত্তর দিতে পারে নাকি? |
| ৬) অবিশ্বাসী হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। | ৬) অবিশ্বাসী হলে হোমিওপ্যাথিকে বোঝা যায় না। |
| ৭) আজ না হয় কাল প্রমাণ হবেই যে ঈশ্বর আছেন | ৭) আজ না হয় কাল প্রমাণ হবেই যে হোমিওপ্যাথিতে কাজ হয়। |
| ৮) আমি নিজে প্রমাণ পেয়েছি ঈশ্বর আছেন, আমার পরিবারে ঈশ্বরের কল্যাণে অনেক কিছু ঘটেছে। | ৮) আমি নিজে দেখেছি হোমিওপ্যাথি তে কাজ হয়, আমার পরিবারের অনেকে হোমিওপ্যাথিতে সুস্থ। |
| ৯) ঈশ্বরে অবিশ্বাসীরা পাপী, নৈতিকতাহীন এবং অহঙ্কারী। | ৯) অ্যালোপ্যাথরা মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে, মানুষকে নিয়ে ব্যবসা করছে। তারা অহঙ্কারী। |
| ১০) মানুষ নিজে যখন ধর্ম/ঈশ্বর বিশ্বাসী হতে চাইছে তখন তুমি নাস্তিক তাকে ভুল বোঝাচ্ছ কেন? তোমার কী সমস্যা? | ১০) মানুষ নিজে যদি বলে হোমিওপ্যাথি কাজ হয়েছে তাহলে তুমি অ্যালোপ্যাথ তাকে ভুল বোঝাচ্ছ কেন? তোমার কী সমস্যা? |

**উপসংহার**

জন্মলগ্নে হোমিওপ্যাথি ছিল একটি জরুরি আবিষ্কার, কেননা সেই সময়ের 'হিরোইক মেডিসিনের' যুগে সেই চিকিৎসায় মানুষের উপকারের থেকে ক্ষতি হত বেশি। হোমিওপ্যাথির খোঁজ করে হ্যানিম্যান স্বল্পদৃষ্টি সম্পন্ন 'প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থা'কে একটি জোরালো ঝাঁকুনি দিয়েছিলেন। যার ফলশ্রুতি হিসেবে প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থা নিজেকে শোধরানোর উদ্দেশ্যে আধুনিক পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, গণিত ও স্ট্যাটিসটিক্স-এর উপরে নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। বিশ শতকে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির পিছনে হোমিওপ্যাথির এই পরোক্ষ ভূমিকা অনস্বীকার্য।

একবিংশ শতকে এসেও হোমিওপ্যাথির উত্থান নতুন করে আবার ভাবাচ্ছে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার উত্তরসূরীদের। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে রোগীকে সামগ্রিকতায় দেখার যে শিক্ষা, তথা রোগীর পাশে বসে তার হাতে শুধুমাত্র চিকিৎসক সুলভ হাতই নয়, পাশাপাশি একজন সমব্যথী মানুষ হিসেবেও হাত রাখার যে বড় প্রয়োজন, তাও শেখাচ্ছে হোমিওপ্যাথি। হোমিওপ্যাথির 'ভাইটাল ফোর্সের' তত্ত্ব আর তার সাথে সাথে হোমিওপ্যাথি নিজেই বিজ্ঞানের কঠোর মানদণ্ডে অনেক আগেই ভ্রান্ত/বাতিল হয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু তার দর্শন যেন যুগে যুগে আধুনিক বিজ্ঞানকে কিছু না কিছু শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে, যাকে শুধুমাত্র দার্শনিক দিক থেকেই সসম্মানে ইন্দ্রিয়-গোচর করার মধ্যে কোনো দ্বিধা না রাখাই শ্রেয়।

**রেফারেন্স:**


১. A Short History of Medicine. F. Gonzalez Crussi. The Modern Library, New York. 2008. P 51-70.

২. http://www.skylarkbooks.co.uk/Hahnemann_Biography.htm

৩.William Osler 1849 – 1919 August 28, 2007 https://www.sueyounghistories.com/2007-08-28-sir-william-osler-and-homeopathy/

৪.English Caricature: Heroic Medicine– Bloodletting, Emetics, and Laxatives http://exhibits.hsl.virginia.edu/caricatures/en2-heroic/

৫.Lectures on Homeopathic philosophy, James Tyler Kent. B Jain Publishers (P) LTD 2002.

৬. Debating Scientific Medicine: Homoeopathy and Allopathy in Late Nineteenth-century Medical Print in Bengal. Shinjini Das Med. Hist. (2012), vol. 56(4), pp. 463_480.

৭.Markie, Peter, "Rationalism vs. Empiricism", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/rationalism-empiricism/>.

৮. https://rationalwiki.org/wiki/Proving_(homeopathy)

৯.The Flexner Report of 1910 and Its Impact on Complementary and Alternative Medicine and Psychiatry in North America in the 20th Century. Frank W. Stahnisch, Marja Verhoef Evid Based Complement Alternat Med. 2012; 2012:

647896. Published online 2012 Dec 26. doi: 10.1155/2012/647896

১০.History of Homeopathy https://www.drmasiello.com/history-of-homeopathy#

১১. Riding the Coattails of Homeopathy's Revival (1985) William M. Rader. May 7, 2006. FDA Consumer Magazine. https://quackwatch.org/homeopathy/history/fdac1/

১২. AYUSH in India. Manju Pilania. Pulished in Jan 17, 2015. https://www.slideshare.net/ManjuPilania/ayush-43609271

১৩. An Overview of the Current Status of the Homeopathic System of Medicine in India and the Need to Achieve its Best. Dr Neeraj Gupta. The Homoeopathic Heritage. August 2012 Page 39-42.

১৪.Hennekens GH & Buring JE. *Epidemiology in Medicine.* Boston: Little and Brown Company, 1987.

১৫.Ghaffar Abdul, Reddy K Srinath, Singhi Monica. Burden of non-communicable diseases in South Asia *BMJ* 2004; 328 :807.

১৬. The History of Medicine: a very short introduction. Willium Bynum. Oxford University Press. 2008. Page 91.

১৭. The Touch of Empathy. Paul C. Rousseau, M.D. and Gerald Blackburn, D.O. JOURNAL OF PALLIATIVE MEDICINE Volume 11, Number 10, 2008.

১৮. Triumph of the light—isopathy and the rise of transcendental homeopathy, 1830–1920. P. Morrel. J Med Ethics: Medical Humanities 2003;29:22–32.

১৯. https://www.britannica.com/science/science

২০. Principles of Evolutionary Medicine. P. Gluckman et al. Oxford University Press. 2016.

২১.Cucherat, M., Haugh, M., Gooch, M. *et al.* Evidence of clinical efficacy of homeopathy . *E J Clin Pharmacol* **56,** 27–33 (2000). https://doi.org/10.1007/s002280050716

২২. Mathie, R.T., Lloyd, S.M., Legg, L.A. *et al*. Randomised placebo-controlled trials of individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis. *Syst Rev* **3,** 142 (2014). https://doi.org/10.1186/2046-4053-3-142.

২৩. AYUSH for New India: Vision and strategy. Bhushan Patwardhan. Editorial / Journal of Ayurveda and Integrative Medicine 8 (2017) 137-139.

২৪. The Declining Presence of Family Physicians in Hospital-Based Care
Anuradha Jetty, Yalda Jabbarpour, Stephen Petterson, Aimee Eden, Andrew Bazemore
The Journal of the American Board of Family Medicine Nov 2019, 32 (6) 771- 72; **DOI:** 10.3122/jabfm.2019.06.190152

২৫. Ghosh K. Why we don't get doctors for rural medical service in India?. Natl Med J India 2018;31:44-6.

২৬. IS HOMEOPATHY A RELIGION ? by Prof. (Dr. of Med.) Charles McWilliams 2010. http://privyinfo.org/popups/homeop=relig.html

২৭. Evans, J.H. (2013), The Growing Social and Moral Conflict Between Conservative Protestantism and Science. JOURNAL FOR THE SCIENTIFIC STUDY OF RELIGION, 52: 368-385. doi:10.1111/jssr.12022

২৮. The Rise of Religious Fundamentalism Michael O. Emerson and David Hartman. Annual Review of Sociology 2006 32:1, 127-144.

২৯. Lakhotia, S. C. Research fund crunch, real or created, is hitting India's academia on the wrong side. *Proc. Indian Natn. Sci. Acad.* 84, 545-547 (2018) doi: 10.16943/ptinsa/2018/49475

30. India Slashes Health Budget, Already One of the World's Lowest. https://www.scientificamerican.com/article/india-slashes-health-budget-already-one-of-the-world-s-lowest/

৩১. Goldacre, B. *Bad Pharma: How drug companies mislead doctors and harm patients*. London: Fourth Estate, 2012.

৩২. An Alternative Perspective: Homeopathic Drugs, Royal Copeland, and Federal Drug Regulation. Suzanne White Junod, Ph.D. September 7, 2003. Food and Drug Law Journal 55:161-183, 2001. https://quackwatch.org/homeopathy/history/reghx/

# হোমিওপ্যাথি — ফিরে দেখার একটি আর্জি

অঞ্জনকুমার সেনশর্মা

**উপক্রমণিকা**

প্রথমেই বলে নেয়া যাক আমি এই পদ্ধতির চিকিৎসক নই, সখেরও না। হোমিওপ্যাথিকে আমি জেনেছি রুগী হিসেবে। প্রথমে একদম শৈশব থেকে নিজের এবং পরে সন্তানদের ও পরিবারের অন্যদের বিভিন্ন ধরনের রোগে এর কার্যকারিতার অভিজ্ঞতা আমার মনে এই চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর একটা সম্ভ্রম সৃষ্টি করেছে। তাই ব্যথা পাই যখন দেখি এই পদ্ধতিকে জ্যোতিষের সমপর্যায়ে ফেলা হচ্ছে বা কৃত্রিম বিজ্ঞান বলে দেগে দেয়া হচ্ছে। আমি নিজেও একসময়ে বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে কিছু প্রশ্ন আমার মনে এসেছে, তাই নির্দ্বিধায় ও পূর্ণ বিনয়ের সঙ্গে সেগুলো বলতে সাহসী হচ্ছি।

আমার বিনীত নিবেদন এই যে ঊনবিংশ শতকের ঊষালগ্নে প্রস্তাবিত এই পদ্ধতির ওপর আপত্তিগুলো সেই সময়কালের বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করেই রয়ে গেছে। দু'দুটো শতাব্দী পেরিয়ে একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যা হোমিওপ্যাথির দার্শনিক ভিত্তির খুব কাছে। আমি তাই মনে করি হোমিওপ্যাথি এখন পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে।

**দার্শনিক ভিত্তি**

আমি যতটুকু বুঝেছি তাতে মনে হয়েছে হোমিওপ্যাথির মূল তাত্ত্বিক স্তম্ভ তিনটি : (১) একটি বিশেষ রোগ এক ব্যক্তিকে সংক্রমিত করে তার নিজেরই প্রতিষেধক ক্ষমতার ত্রুটির কারণে। (২) যে বস্তু মানবদেহে একটি প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে সেই বস্তুই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মাত্রায় প্রয়োগ করলে সেই প্রতিক্রিয়াকে প্রতিরোধ করে। (৩) প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা সেই সূক্ষ্মতার মাত্রা বাড়ার সঙ্গে বেড়ে যায়।

প্রথম উপস্থাপনাটি আমার কাছে আধুনিক বিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্তের সব থেকে কাছে যে কোনো ব্যক্তির একটি রোগের প্রতি স্পর্শকাতরতা সেই ব্যক্তির একেবারে জিনের (gene) অন্তর্নিহিত কারণে। এই কথা মনে রেখে ওষুধ নির্বাচন করতে হবে, অর্থাৎ, চিকিৎসা হবে রুগী নির্ভর, রোগ নির্ভর নয়।

হোমিওপ্যাথির জন্মলগ্নে বিজ্ঞান যে স্তরে ছিল তাতে হয়তো এই ভাবনা ঠিক এই ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না, কিন্তু সিদ্ধান্ত আসলে এই-ই ছিল।

দ্বিতীয় স্তম্ভ সম্বন্ধে আমার ধারণা টীকাকরণ ও অ্যালার্জির চিকিৎসা এই নীতিতেই হয়। পার্থক্য এই যে আধুনিক চিকিৎসার টিকাকরণ হয় সংক্রমণকারী রোগকে প্রতিহত করার জন্য, সে ক্ষেত্রে হোমিও ওষুধের উদ্দেশ্য থাকে শরীরের সহজাত প্রতিষেধক ক্ষমতাকে শক্তিশালী করা।

**সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্য : জলের স্মৃতি?**

এই তৃতীয় স্তম্ভটাই যত কিছু বিতর্ক, বৈরিতা ও বিদ্রূপ সৃষ্টি করে। কোনো বস্তুকে তরলীকরণ করে যখন এই পর্যায়ে নিয়ে আসা হয় যেখানে তার (আভোগাদ্রো তত্ত্ব অনুসারে) একটি অণুও উপস্থিত থাকে না তখন তা কি করে ঔষধ হিসাবে স্বীকৃতি পায় তার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হোমিওপ্যাথদের কাছে ছিল না। যদিও এর কার্যকারিতা তারা বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখেছেন। দু'শতাব্দী প্রাচীন এই রহস্যের কিনারা করতে বর্তমান যুগের হোমিও প্রেমী বিজ্ঞানীরা তাই আধুনিক বিজ্ঞানের শরণাপন্ন হয়েছেন।

এটা অনস্বীকার্য যে কোনো বস্তু অতিমাত্রায় Avagadro Limit ছাড়িয়ে জলে তরল করলে যা থাকে তা রাসায়নিক ভাবে $H_2O$ ছাড়া কিছু নয়। তাই গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়লো $H_2O$, জল। কারণ অদ্ভুত হলেও এই অপরিহার্য সিদ্ধান্ত নিতে হল যে জলই কোনো ভাবে ওষুধে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

প্রশ্ন হল এই পরিবর্তনটা ঘটে কিভাবে?

বহু গবেষণা, যার মধ্যে অনেকগুলিই হোমিওপ্যাথি

সম্পৃক্ত নয়, এ আভাস দেয় যে একই রাসায়নিক প্রতীকের পদার্থের অণুর গঠন বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন হতে পারে। অর্থাৎ প্রতীক $H_2O$-র অণুর গঠন সেই তরলীকৃত মূল বস্তুর এবং তার সূক্ষ্মতার মাত্রা অনুসারে বিভিন্ন হওয়া সম্ভব।

পথের সন্ধান দেয় ১৯৭৭ সালে রসায়নে নোবেলজয়ীর এক গবেষণা। Ilya Prigogine আবিষ্কার করেন যে জলে খুব ছোট মাপের অসমতা পরিবেশের সঙ্গে শক্তি বিনিময় করে বড় মাপের নকশায় পরিণত করতে পারে। ১৯৮৮ সালে Jacqns Benveniste 'জলের স্মৃতি' নামে একটি তত্ত্ব উপস্থাপনা করেন। এতে প্রস্তাব করা হয় যে কোনো বস্তু যখন জলে এত তরল করা হয় যে মূল বস্তুর একটি কণাও (Avogadro অনুসারে) এতে থাকে না তখন সেই বস্তুর স্মৃতি ধরে রাখার ক্ষমতা জলের আছে।

Emilio D Guidice ২০০৯ সালে পুরস্কৃত হন Quantum Electro-dynamic ব্যবহার করে এই আবিষ্কার করে যে তরলীকৃত বস্তু সংক্রান্ত তথ্য বহন করার এবং ধরে রাখার প্রচণ্ড ক্ষমতা জলের আছে যা শুকিয়ে ফেললেও থেকে যায়। তারপরে ২০১০ সালে Luc Montagnier (এইচ আইভি ভাইরাস আবিষ্কারের জন্য ২০০৮ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল) একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রমাণ দাখিল করেন যে জলে দু'একটি ভাইরাস-এর উপস্থিতি জলকে এমন প্রভাবিত করে যে সেই প্রভাব ভাইরাসগুলোকে পুরোপুরি সরিয়ে নিলেও থেকে যায়। এর কোনোটাই অবশ্য অন্যান্য বিজ্ঞানীদের অবিশ্বাসকে টলাতে পারে নি।

২০১৭ সালে C R Mohata নামে জনৈক প্রবীণ Electrical Emgineer (Formerly Emiritus Professor, IIEST, Shibpur) Atomic Force Microscopy-র ছবি তুলে দেখান যে জলের অণুর গঠনগত পরিবর্তনগুলো বিভিন্ন বস্তুর এবং তাদের তারল্য অনুসারে বিভিন্ন হয়। তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে হোমিও ওষধির নিরাময় করার ক্ষমতা যথার্থভাবে তরলীকৃত আদি বস্তুটির স্থূল উপস্থিতির ওপর নির্ভর করে না, করে জলের অণুর গঠনের যে পরিবর্তন হয় তার ওপর। প্রমাণস্বরূপ ছবিগুলো সহ তাঁর প্রবন্ধটি কোনো বিজ্ঞান পত্রিকা ছাপাতে রাজি হয় নি।

এই মনোভাবের বিরুদ্ধে সবচেয়ে জোরালো প্রতিক্রিয়া এসেছিল (১৯৭৭ সালে নোবল) পদার্থবিদ Brian Josephson-এর কাছ থেকে। ১৯৯৭ সালে তিনিই প্রথম সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন যে ''হোমিও ঔষধটির প্রবক্তারা এদের প্রভাব জলে মূল বস্তু কতটা আছে তার ওপর নির্ভরশীল বলে গণ্য করেন না, করেন জলের অণুর গঠনের ওপর সেই বস্তুর প্রভাবের ওপর।" তিনি আরও বলেন যে, ''যদি যথার্থ হয় তবে এর গুরুত্ব হোমিওপ্যাথির থেকে বেশি হবে। এবং এটা বর্তমান বিজ্ঞানী মহলের অদূরদর্শিতার প্রমাণ যে এই দাবি দ্রুত পরীক্ষা করা দূরের কথা তাদের একমাত্র প্রতিক্রিয়া ছিল এগুলো পত্রপাঠ খারিজ করা।"

**বাণিজ্যের গ্রাসে বিজ্ঞান**

যখন অকাট্য তথ্য হোমিও ঔষধির কার্যকারিতা প্রমাণ করে দেয় তখন বক্রোক্তি করা হয় যে এগুলো ঔষধকল্পের (Placebo) প্রভাব মাত্র। যদিও হোমিও ওষধির প্রভাব যে ঔষধকল্পের নয় তার প্রমাণ শিশু ও পশুদের ওপর এর কার্যকারিতা। তবু যদি রোগ নিরাময়ে ঔষধকল্পের এতই শক্তি তাহলে তো প্রশ্ন ওঠে আধুনিক চিকিৎসায় এর ব্যবহার করা হয় না কেন? এতে শুধু যে রোগীরা অযথা ব্যয়ের হাত থেকে বাঁচবেন তা নয়, বাঁচবেন অধিকাংশ ওষুধের ক্ষতিকর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থেকেও। বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করতে চাই যে এ ব্যাপারে কোনো গবেষণা করা হয় না সেই একই কারণে যে কারণে হোমিওপ্যাথি নিয়েও গবেষণা হয় না। বাণিজ্য বিজ্ঞানকে গ্রাস করে। যে সব গবেষণায় অতিকায় বহুজাতিক ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাদের মুনাফা কমে যাবার সম্ভাবনা থাকে সে সবের জন্য আর্থিক অনুদান পাওয়া যায় না। এবং সবাই জানেন গবেষকদের আর্থিক অনুদানের ওপর নির্ভর করতেই হয়, শুধুমাত্র জীবনধারণের জন্য হলেও। তার ওপর গবেষণার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিসপত্রের জন্যও প্রচুর অর্থ প্রয়োজন। অত্যন্ত রূঢ় শোনালেও এটা বলতেই হবে যে নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কারে উৎসাহ দেবার অভিপ্রায় যতটা না মানুষের উপকারের জন্য ততটা আরও মুনাফার জন্য। এইচআইভি ও কর্কট রোগের ওষুধের ক্ষেত্রে এটা পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। বহু সমাজসেবী সংস্থা এ ব্যাপারে সরব হয়েছেন।

**অপব্যবহার**

হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায় যে এটা হাতুড়েরা সহজেই অপব্যবহার করতে পারে। অতীতের কথা জানি না কিন্তু বর্তমানে চোখ খোলা রাখলে যে কেউ দেখতে পাবেন এখন গ্রামে, শহরতলিতে, এমনকি শহরের অলিগলিতেও হাতুড়েরা কিভাবে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি অপব্যবহার করে ধনী হয়ে যাচ্ছে। ওষুধের দোকানের বিক্রেতার উপদেশে ওষুধ খাওয়া তো বহুদিন প্রচলিত।

কিভাবে এই অপব্যবহার প্রাণদায়ী ওষুধগুলোর কার্যকারীতা কমিয়ে দিয়েছে তাও সবার জানা, ক্ষতিকারক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কথা ছেড়েই দিলাম। অন্তত এই শেষ বিপদটি হোমিও ওষধির ক্ষেত্রে অনেকাংশে নামমাত্র। অবশ্য অনেকেই আছেন যাঁরা এ কথার সঙ্গে একমত নন। সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে যে এদের মধ্যে অধিকাংশই তাঁরা যাঁরা বিশ্বাস করেন না হোমিও ওষুধ কোনো কাজ করে।

হোমিও চিকিৎসার আরেকটি কুফল বলা হয় যে এর ওপর নির্ভর করে বহু রোগীর জটিলতা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে তার পরে আর কিছুই করার থাকে না। এটা অবশ্যই ঘটনা যে বহু মারণ রোগ, যেগুলোর আগে নিরাময় করা যেত না, নতুন ওষুধ আবিষ্কার হওয়ায় সেগুলো থেকে প্রাণহানি এখন নগণ্য। কিন্তু এই সব আধুনিক চিকিৎসা কি অকাল মৃত্যু পুরোপুরি মুছে ফেলতে পেরেছে এমনকি অর্থ সামর্থে এবং বৈজ্ঞানিক দিক থেকে অগ্রগণ্য দেশগুলো থেকেও? তাই চিকিৎসাধীন রোগীর মৃত্যু শুধুমাত্র হোমিওপ্যাথদের হাতেই হয় এ দাবি করা অযৌক্তিক। চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা ও বিশেষ জ্ঞানের (specialization) তারতম্য সব পদ্ধতিতেই ফলপ্রসূতার প্রধান নির্ধারক। ঠিক যেমন আধুনিক চিকিৎসায়, হোমিওপ্যাথিতেও হাতুড়ে থেকে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ, এই পুরো শ্রেণীর চিকিৎসক রয়েছেন। সেদিক থেকে চিকিৎসক নির্বাচন রোগীর অভিভাবকদের পক্ষে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। কিন্তু বিপদ শুধু অনভিজ্ঞ অদক্ষদের কাছ থেকে নয়, বিপদ আরও গুরুতর সেই সব আধুনিক পদ্ধতির চিকিৎসকদের কাছ থেকে যারা দক্ষ হলেও যত্নহীন। এ অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই অনেকের হয়েছে। বর্তমান যুগের পূর্ণ শিক্ষিত হোমিওপ্যাথরা মারণরোগের রোগীদের আধুনিক চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠাতে দ্বিধা করেন না।

**সিদ্ধপ্রমাণ**

হোমিওপ্যাথিক ওষুধের ক্ষেত্রে আরও একটি আপত্তি তোলা হয় যে তাদের ক্ষেত্রে কার্যকারিতা বিষয়ে দীর্ঘকাল ধরে করা নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা নিরীক্ষা যা আধুনিক ঔষধ বিজ্ঞানের অপরিহার্য অঙ্গ, তা করা হয় নি। হয়তো হয় নি। হয়তো যে জাতীয় সহায়তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগ এ ধরনের কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজন তা সে সময়ে লভ্য ছিল না। কিন্তু অদ্ভুত লাগে যে একই আপত্তি আয়ুর্বেদ ওষুধের ক্ষেত্রেও তোলা যেত কিন্তু তা হয় না। বরঞ্চ অনেক আয়ুর্বেদীয় ওষধি আধুনিক চিকিৎসায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, অন্তত আমাদের দেশে, সম্ভবত দার্শনিক সাযুজ্যতার কারণে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে এই একই আপত্তি শল্য চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধেও তোলা যায়। তাই মনে হয় আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির হোমিওপ্যাথি বৈরিতার কারণ এ দুটি পদ্ধতির বিপরীত দার্শনিক ভিত্তি। দুটি ধর্মের মধ্যে বৈরিতার মতো।

**হোমিও ভুবন**

আমাদের মতো দরিদ্র দেশে, যেখানে স্বাস্থ্য পরিষেবা খুবই ব্যয়সাধ্য সেখানে স্বাভাবিকভাবেই হোমিওপ্যাথির আকর্ষণ প্রবল। কিন্তু বিভিন্ন উন্নত দেশের সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার সংগঠন (যথা ব্রিটেনের এন এইচ এস, মার্কিন আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদির)গুলোর ঘোষিত মত 'কোনো উচ্চমানের প্রমাণ নেই যে হোমিওপ্যাথি কোনো অসুখের চিকিৎসা হিসেবে কার্যকরী হওয়া সত্ত্বেও সে সব দেশে হোমিওপ্যাথির জনপ্রিয়তা ও উপস্থিতি আশ্চর্যজনকভাবে উল্লেখযোগ্য। সেখানে হোমিও ওষুধের বাজারও বিশাল। উদাহরণ এর পেছনে ২০০৮ সালে মার্কিন ডলারে খরচ করেছে — ফ্রান্স ৪০.৮ কোটি, জার্মানি ৩৪.৬ কোটি, ব্রিটেন ৬.২ কোটি। আর ২০০৭ সালে আমেরিকায় প্রাপ্তবয়স্করাই খরচ করেছে ২৯০ কোটি?

অপরদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO, হু) মনে হয় হোমিওপ্যাথির ব্যাপারে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ২০০৭ সালে ইতালির মিলান শহরে 'হু' হোমিওপ্যাথিক ওষুধের গুণগত মান সম্বন্ধে একটি পরামর্শ সভার আয়োজন করে। সেই ইতালিরই লোম্বার্ড শহরে ২০০৯ সালে 'হু' হোমিওপ্যাথিক ওষুধ তৈরিতে কি কি নিরাপত্তা বিচার্য সে বিষয়ে একটি আলোচনা সভা আয়োজন করে। অথচ সেই ২০০৯ সালেই ওই একই প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য বলে দাবি করে বিবিসি (BBC) একটি বিবৃতি প্রচার করে যাতে বলা হয় যে হোমিওপ্যাথি এইচ আই ভি, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া ও শিশুদের দাস্তে কাজ করে না। মজার কথা এই যে এই বিবৃতি পরোক্ষে স্বীকার করে নেয় যে হোমিওপ্যাথি ওই রোগগুলো ছাড়া অন্যান্য রোগে কাজ করে।

এই বিবৃতির মূল লক্ষ্য ছিল আফ্রিকার হোমিও চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে যারা তখন সেখানের এইচ আই ভি মহামারীর সঙ্গে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। একদল শিক্ষানবীশ ডাক্তারদের অনুরোধে এটা প্রচার করা হয়েছিল যারা তখনও আধুনিক চিকিৎসার সীমাবদ্ধতা আর ছায়াচ্ছন্ন দিকগুলোর অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয় নি। অন্যথায় তাঁরা জানতেন কোনো সঠিক শিক্ষাপ্রাপ্ত হোমিওপ্যাথ সে সব প্রাণঘাতী রোগের

চিকিৎসা হাতে নেন না যেগুলোর সুনির্দিষ্ট আধুনিক চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়েছে। সব দায়িত্বশীল চিকিৎসকই রোগীর স্বার্থ তাঁর নিজের স্বার্থ থেকে বেশি মূল্য দেন, তিনি যে পদ্ধতির চিকিৎসকই হোন না কেন। যে সব অঞ্চলে আধুনিক চিকিৎসা সেবা অনুপস্থিত (আমাদের দেশে এ পরিস্থিতি বিরল নয়) সেখানে তাঁরা বাধ্য হন তাঁদের সাধ্যে যথাসম্ভব সুচিকিৎসা চালিয়ে যেতে। এই পরিস্থিতির জন্য তাদের দায়ী করা অত্যন্ত অনৈতিক।

**হোমিওপ্যাথির সমর্থনে**

আমার মতো অসংখ্য নগণ্য ছাড়াও হোমিওপ্যাথির অগণ্য বিখ্যাত ভক্ত আছেন যাঁদের মধ্যে অনেকেই যুক্তিবাদী। অনেক বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথ আছেন যাঁরা আধুনিক চিকিৎসায় পুরো শিক্ষিত হয়ে আধুনিক চিকিৎসায় পেশা শুরু করেছিলেন (যেমন করেছিলেন হোমিওপ্যাথির প্রবক্তা নিজে) কিন্তু পরে হোমিওপ্যাথিতে চলে এসেছিলেন। এ ব্যাপারে সব থেকে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিজ্ঞানচর্চার ভারতীয় সমিতির (Indian Association for Cultivation of Science) প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। এটা অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে এতে প্রমাণ হয় না যে হোমিওপ্যাথি বিজ্ঞানসম্মত, কারণ বহু তথাকথিত বিজ্ঞানী জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন। এটুকুই বলা যায় যে হোমিও পদ্ধতির মধ্যে এমন কিছু আছে যা যুক্তিবাদী মানুষদেরও আকর্ষণ করে এবং তাই তা বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষা দাবি করে। বিশেষ করে যখন আধুনিক চিকিৎসার খরচ সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন ধরনের হাতুড়েদের শরণাপন্ন হতে বাধ্য করছে। কিছু উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানী, নোবেলজয়ী সহ, হোমিওপ্যাথির দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন। বিজ্ঞান অবশ্যই খ্যাতিকে সম্মান করে না, করে শুধু যুক্তিকে। কিন্তু তবু যদি হোমিওপ্যাথি একটা আপাত যুক্তিহীন প্রণালীও হয় কিন্তু বাস্তব ব্যবহারিক ফল দেয় তবে তো সেই পদ্ধতির ওপর যথোচিত গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

একটা তুলনা মনে আসার জন্য বিজ্ঞানীদের কাছে আমি সহস্র ক্ষমাপ্রার্থী। সৃষ্টি রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য একটি 'কণা'র অস্তিত্ব প্রথমে তাত্ত্বিক পর্যায়ে প্রস্তাব করা হয়েছিল। আর তারপরে এক বিশাল কার্যক্রম হাতে নেওয়া হল শুধুমাত্র সেই কণা— যাকে সংবাদমাধ্যম 'ঈশ্বরকণা' বলে বাণিজ্য করেছে, তার একটু ক্ষণিক আভাস পেতে। বিজ্ঞানীরা কী সেই উদ্যমের বিন্দুমাত্র অনুরূপ একটি রহস্য উদ্ঘাটনে ব্যয় করতে পারেন না যা শুধুমাত্র চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিপ্লব আনবে না, মানুষের অপরিমেয় উপকারে আসবে। অবশ্যই এটা একটা বিশাল প্রকল্প হতে হবে যাতে বিজ্ঞানের প্রায় সব গবেষণাধর্মী শাখাই যুক্ত হতে হবে--- পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, রসায়ন ইত্যাদি। অবশ্যই তাঁরা পারেন, যা দরকার তা হচ্ছে এর সম্ভাব্য যুগান্তকারী সুফল সম্বন্ধে প্রত্যয়। আর দরকার বহুজাতিক ওষুধ প্রস্তুতকারী দৈত্যদের সঙ্গে যোঝবার ক্ষমতা।

**সিদ্ধান্ত**

চিকিৎসা রোগকেন্দ্রিক না হয়ে রোগী কেন্দ্রিক হতে হবে এটা ইতিমধ্যেই স্থির হয়েছে। আশা করা যায় হোমিও ওষুধির কার্যকারিতার রহস্যও একদিন উদ্ঘাটিত হবে। হোমিও ওষুধির প্রধান দুটি গুণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার আর মূল্যের নগণ্যতা। এ দুটিই আমাদের মতো দরিদ্র দেশের পক্ষে প্রচণ্ড আকর্ষণীয়। তাই সবিনয় নিবেদন ঃ অন্ধ-বিরোধ বিচারবুদ্ধিকে মেঘাচ্ছন্ন করে। গভীরে প্রোথিত বিশ্বাস, যা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে অবহেলা করে তা বিজ্ঞান-বিরোধী। তাই আবেদন, বিরোধিতার এই মনোভাব ঝেড়ে ফেলে হোমিওপ্যাথির দিকে নতুন দৃষ্টিপাত করা হোক।

**উল্লেখপঞ্জী :**


1. Ilya Progigine (1977) Nobel Prize for his contribution to non-equilibrium thermodynamic, particularly the theory of dissipative structures.
2. Benveniste J. et. al., (1988), "Human basophil degranulation triggered by very dilute antiseum against IgE". *Nature* 333 (6176) 816-18
3. Josephson, B, (1997), Molecule Memories, *New Scientist, Letters*, Nov 1, 1997.
4. Montagnier, L. et. al. (2009), "Electromagnatic Signals Are Produced by Aqueous Nanostructures Derived from Bacterial DNA Sequences". *Interdisciplinary Sciences: Computational Life Sciences*, Volume 1, Number 2, 81-90
5. Emilio D Guidice 2010 Water: A Medium where dissipotive structures are produced by a coherent dynamics. J. Theor, Biol, 2010; 265(4): 511-516
6. AL Konavalvo & V Elia, 2014 Highly diluted aquous solutions: Formation of Nano sized molecular assemblies (Nano Associates); Geo Chemistry International, 2014, 52 16 Dec.
7. WHO : Consultation on quality of Homeopathic medicine, June 2007, Milan, Italy.
8. WHO : Safety issue, in preparation of Homeopathic medicines, 2009, Lombardy, Italy.


উমা

# হোমিওপ্যাথি নিয়ে

## বিষাণ বসু

স্বাস্থ্যবিষয়ক যে কোনো সঙ্কটের মুহূর্তে, অর্থাৎ যেমন ধরুন মহামারী বা অতিমারীর সময়ে, সেই পুরনো বিতর্ক আবার চাগিয়ে ওঠে, সঙ্কটটির মোকাবিলা হবে কোন পথে? শুধুই আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান বা মডার্ন মেডিসিন, নাকি বাকি সব চিকিৎসাপদ্ধতিও — যাদের একত্রে এদেশে আয়ুষ বলে ধরে নেওয়া হয়— যথাযথ গুরুত্বের সাথে কি বিবেচিত হবে? সাম্প্রতিক কোভিড পরিস্থিতিও ব্যতিক্রম নয়।

একটিমাত্র চিকিৎসাপদ্ধতিকেই আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে দাগিয়ে দেওয়ার মধ্যে নিশ্চিতভাবেই একধরনের উন্নাসিকতা রয়েছে এর মধ্যেকার অন্তর্নিহিত বার্তাটিই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের। কিন্তু, আজ সেই বিতর্কের মধ্যে ঢুকছি না। এই লেখায় আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান বা মডার্ন মেডিসিন শব্দবন্ধটি সুপিরিয়রিটি অর্থে নয়, স্রেফ একটি বিশেষ চিকিৎসাদর্শন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে— যে চিকিৎসাপদ্ধতিকে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারবাবুরা অ্যালোপ্যাথি বলে থাকেন। এই আলোচনা আয়ুষের অন্তর্গত সবকটি শাখাপ্রশাখা নিয়ে নয়, এই দফার আলোচ্য বিষয় শুধুই হোমিওপ্যাথি।

**একটিমাত্র চিকিৎসাপদ্ধতিকেই আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে দাগিয়ে দেওয়ার মধ্যে, নিশ্চিতভাবেই, একধরনের, উন্নাসিকতা রয়েছে এর মধ্যেকার অন্তর্নিহিত বার্তাটিই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের। কিন্তু, আজ সেই বিতর্কের মধ্যে ঢুকছি না। এই লেখায় আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান বা মডার্ন মেডিসিন শব্দবন্ধটি সুপিরিয়রিটি অর্থে নয়, স্রেফ একটি বিশেষ চিকিৎসাদর্শন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে --- যে চিকিৎসাপদ্ধতিকে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারবাবুরা অ্যালোপ্যাথি বলে থাকেন। এই আলোচনা আয়ুশের অন্তর্গত সবকটি শাখাপ্রশাখা নিয়ে নয়, এই দফার আলোচ্য বিষয় শুধুই হোমিওপ্যাথি।**

সমকালীন পরিস্থিতির অনুষঙ্গে আলোচনায় ঢুকতে চাইলে, কোভিড নিয়ে আতঙ্কের পরিস্থিতি উদ্ভূত হওয়ার আগেই দেশের সরকার বিশেষ একটি হোমিও ওষুধকে প্রতিষেধক হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। এমন করে চিহ্নিত করার ব্যাপারে সব হোমিওপ্যাথ একমত ছিলেন, এমন নয়। যাঁরা ভিন্নমত ছিলেন, তাঁদের বক্তব্যের মূল কথা ছিল, হোমিওপ্যাথি ঠিক ওইভাবে সবার জন্যে একই ওষুধ একইভাবে কার্যকরী হবে সেকথা বলে না, এইধরনের পাইকারি সরকারি বিজ্ঞপ্তি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাদর্শনেরই বিপ্রতীপ এবং এই বিজ্ঞপ্তি যদি গরিষ্ঠসংখ্যক নাগরিক অনুসরণ করেন, তাহলে হোমিওপ্যাথি নিয়েই বিভ্রান্তি বাড়বে। আবার, কোভিড পরিস্থিতি বেশ জাঁকিয়ে বসার মুহূর্তে দেখা গেল, সরকারবাহাদুর কেবলমাত্র আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান বাদে বাকি কোনোটিকেই বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দিচ্ছেন না। থালা বাজানো বা পুষ্পবৃষ্টি --- আপাতদৃষ্টিতে, আয়ুষ চিকিৎসকদের উদ্দেশে কোনোটিই নয়। প্রধানমন্ত্রী যোগের মাধ্যমে রোগ ঠেকানোর বার্তা দিলেও বাকি শাখাগুলি নিয়ে কিছুই বলছেন না। স্বভাবতই, আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতির ডাক্তারবাবুরা বলছেন — তাহলে এত খরচা করে আয়ুষ ডাক্তার তৈরি করার যুক্তি কী? হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধপক্ষের অনেকে আরেকটু এগিয়ে বলছেন — এই তো, এবারে দুধ আর জল আলাদা হয়ে গেল!

হোমিওপ্যাথি পদ্ধতিতে চিকিৎসা করেন যাঁরা, তাঁদের একাংশ রীতিমতো বিরক্ত। তাঁদের বক্তব্য, তথাকথিত আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে যখন এই অসুখের নির্ভরযোগ্য কোনো চিকিৎসা নেই, তাহলে হোমিওপ্যাথিকে একবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না কেন? সঙ্কটকালে যদি সরকার হোমিওপ্যাথিকে অচ্ছুৎ করে রাখেন, তাহলে সে চিকিৎসার উপর মানুষ ভরসা করবেন কী করে! এভাবে তো হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকে ইচ্ছাকৃতভাবে পিছন থেকে টেনে ধরে রাখা হচ্ছে! তাঁদের কথাগুলোও কোনোভাবেই অযৌক্তিক নয়। তাহলে, আমরা কোনখানে দাঁড়িয়ে? আসুন, নিজেদের অবস্থান যাচাই করে দেখার মুহূর্তে, হোমিওপ্যাথি নিয়ে যে প্রশ্নগুলো বারবার উঠে আসে --- আসে মূলত আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতির চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীদের দিক থেকে এবং যুক্তিবাদী

মানুষদের দিক থেকেও। সেই প্রশ্নগুলো ফিরে দেখা যাক।

এই লেখায় যে কথাগুলো বলব, সেগুলো মূলত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাদর্শন এবং তার পিছনে থাকা বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানের অভাব নিয়ে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান শরীরবিজ্ঞান আর রসায়নের উন্নতির উপর ভর করে যে পথে এগিয়েছে, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে হোমিওপ্যাথির মূলগত দর্শনকে দেখার চেষ্টা করব। উন্নত কোন দেশে হোমিওপ্যাথির রমরমা বাজার বা কোন দেশে হোমিওপ্যাথি নিষিদ্ধ বা রবীন্দ্রনাথ-বিদ্যাসাগর হোমিওপ্যাথির উপর ভরসা রাখতেন কি রাখতেন না — এসব বিষয়, যা কিনা অনেকের কাছেই সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সে নিয়ে বিশদ আলোচনা এখানে থাকবে না।

প্রথমেই জানিয়ে রাখা যাক, আমি মডার্ন মেডিসিন ওরফে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসক — আর অন্য চিকিৎসাপদ্ধতি বিষয়ে খুব একটা বিস্তারে জানি না। আর, সেই না জানার জন্যেই, অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতি বিষয়ে আমি সচরাচর খুব একটা কথাবার্তা বলতে চাই না। কিন্তু, আমাদের করের টাকায় আমাদের পরিজনের চিকিৎসা কোন পথে হওয়া উচিত, প্রশ্নটা যখন এইটি তখন চিকিৎসক বা সাধারণ নাগরিক, কোনো দিক থেকেই চুপ থাকা সমীচীন নয়। অতএব, শুরুতেই ডিসক্লেইমার দেওয়া রইল, এ লেখা মূলত কান্ডজ্ঞান প্রসূত।

কিন্তু, তা বলে ধরে নেবেন না, চায়ের দোকানে রাজাউজির মারার মতো আলটপকা মন্তব্যের সমষ্টি এই লেখা। শুরুতেই যে কথাটা বললাম — কান্ডজ্ঞান — কিন্তু, সেই কান্ডজ্ঞানের পেছনে বিগত দুই দশকের বেশি সময় ধরে মানুষের চিকিৎসার সাথে জড়িয়ে থাকার অল্পবিস্তর অভিজ্ঞতা এবং ওষুধপত্রের সাথে সাথে চিকিৎসকের কথাবার্তা বা রোগীর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা ও মনের জোর নিরাময়ের ক্ষেত্রে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, সেটুকু বোঝার এবং চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করারও সৌভাগ্য রয়েছে।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাপদ্ধতি বা তার পিছনে যে বিজ্ঞান বা অবিজ্ঞান সে নিয়ে আমার খুব বিস্তারিত পড়াশোনা নেই। অন্য একটি চিকিৎসাদর্শনের পাঠ আমি নিয়েছি, আমার দৈনন্দিন যাপন ও জীবিকা জড়িয়ে সেই চিকিৎসাপদ্ধতি ধরেই। সেই কারণে এবং হোমিওপ্যাথি বিষয়ে অনিশ্চিত ধারণা ও সেই পদ্ধতির বিজ্ঞানগত অনিশ্চয়তার কারণেও, এই চিকিৎসাপদ্ধতির মাধ্যমে নিকটজনের অসুস্থতার তদারকি হবে, এটা আমার কাছে সবসময় গ্রহণীয় নয়। কিন্তু, বৃহত্তর সমাজের ক্ষেত্রেও সেই একই যুক্তি কি সমভাবে প্রযোজ্য? সরকার পয়সা খরচ করে এই চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ান, এই ব্যবস্থায় শিক্ষিত চিকিৎসকদের সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় নিয়োগও করেন। কাজেই, এই ব্যবস্থা যদি একেবারেই ভুল হয় বা ভ্রান্ত বিজ্ঞান হয়, তাহলে এর পেছনে অর্থব্যয় জাতীয় সম্পদের অপচয়। তাই না? অতএব, বিতর্ক জরুরি। সেই বিতর্ক নতুন, এমন নয় — বিতর্কের নিষ্পত্তি করে ফেলা গেছে বলে আধুনিক ডাক্তারবাবুরা নিশ্চিত হলেও, সব মানুষ সহমত নন, অন্তত সরকারবাহাদুর তো একেবারেই নিশ্চিত নন, অতএব, বিতর্কের বিভিন্ন দিক আরেকবার দেখে নেওয়াই যায়।

দ্বিতীয়ত, কোনটা বিজ্ঞান আর কোনটা নয়, সে নিয়েও আমার স্পষ্ট ধারণা নেই। মানে, ঠিক কোন পদ্ধতিটি বিজ্ঞান হিসেবে সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য আর কোনটি নয়, সে নিয়ে আমার ধারণা বেশ ভাসা ভাসা। কিন্তু, ওই যে দার্শনিক কার্ল পপারের "বিজ্ঞান-তাই-যাকে-ভুল-প্রমাণ-করা-সম্ভব" অর্থাৎ ফলসিফায়েবিলিটি, সেই কথাটি আমারও মনে ধরে। যে কোনো বিতর্ক শুরুর আগে, কিছু সাধারণ সূত্র মেনে নেওয়া থাকে। পপারসাহেবের এই যাকে-ভুল-প্রমাণ-করা-যায় সে কষ্টিপাথরও তেমন - অর্থাৎ, ফলসিফায়েবিলিটির তত্ত্বকে গ্রাহ্য মেনেই আলোচনায় ঢুকছি। উদাহরণ চাইলে, জ্যোতিষশাস্ত্র আমার কাছে অবিজ্ঞান — কেননা, ভবিষ্যদ্বাণীর ভুল হাজারবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেও, জ্যোতিষীরা সেটাকে ব্যক্তি-জ্যোতিষীর ভুল হিসেবেই দেখাতে চান, তাঁদের কাছে সর্বদাই জ্যোতিষ অভ্রান্ত এবং অনতিক্রম্য। অর্থাৎ, যা খামতিই প্রকাশ্যে আসুক, অনুসারীদের কাছে জ্যোতিষ কদাপি ফলসিফায়েবল নয়।

হোমিওপ্যাথি নিয়ে কথাবার্তা এগোনোর আগে মনে করিয়ে দেওয়া যাক, এই বিদ্যার বুনিয়াদি ভাবনাগুলোকে ইতিহাস থেকে উৎপাটিত করে শুধুই এখনকার প্রেক্ষিতে ফেলে দেখতে চাওয়াটা অনুচিত হবে। সব দর্শনই তার সমকাল থেকে এবং সমকালের বিশেষ চাহিদা মেটানোর প্রয়োজনে উদ্ভূত। ব্যক্তিগতভাবে আমার মতামত যদি জানতে চান, তাহলে বলি, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাদর্শনের বেশ কিছু কথা আজও সমান প্রাসঙ্গিক, হয়ত এই বাণিজ্যমুখী চিকিৎসাব্যবস্থায় আরো বেশি করে প্রাসঙ্গিক।

আজ থেকে দুশো বছরেরও আগে, ইউরোপে স্যামুয়েল হ্যানিম্যানসাহেব যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার গোড়াপত্তন করেছিলেন, বা সেই চিকিৎসাপদ্ধতির প্রসার ঘটিয়েছিলেন— সে ভাবনার উৎস ছিল সে দেশের তৎকালীন স্বাস্থ্য ও আরোগ্য পরিস্থিতি এবং প্রথাগত ভাবনার বিপরীতে হেঁটে। সেই ভাবনা ছিল দুঃসাহসিক। পাশাপাশি এও মাথায় রাখা যাক, প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসাব্যবস্থার কাছ থেকে হ্যানিম্যানসাহেব সহযোগিতা না পেলেও এবং আজকের আধুনিক ডাক্তারবাবুরা হোমিওপ্যাথিকে অনুকম্পা বা বিরক্তির দৃষ্টিতে দেখতে চাইলেও পরিস্থিতি চিরকাল এমন ছিল না।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানকে ঠিক আজকের রূপে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে যে কয়েকজন চিকিৎসকের নাম সর্বাগ্রে আসে— গবেষকদের কথা বলা হচ্ছে না, যে গবেষকরা অসুখের পিছনে শরীরবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা বা জীবাণু খুঁজে আনেন, তার ওষুধ আবিষ্কার করেন, নিত্যনতুন পরীক্ষানিরীক্ষার পদ্ধতি বা যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেন, আমি তাঁদের কথা বলছি না, বলছি, যে চিকিৎসকরা চিকিৎসা করার মধ্যে দিয়ে এবং সে বিষয়ে অনুপুঙ্খ দৃষ্টিজাত মতামতের মধ্যে দিয়ে বদলে দিয়েছেন চিকিৎসার দর্শন — তাঁদের মধ্যে উইলিয়াম অসলার-এর নাম অগ্রগণ্য। সেই অসলার-কে উদ্ধৃত করেই আলোচনার শুরু করা যাক—
"Ask not what kind of illness the patient has, ask what kind of patient has the illness... No one individual has done more good to the medical profession than Hahnemann"

অর্থাৎ, রোগীর কী অসুখ হয়েছে, সেই প্রশ্ন নয় — জিজ্ঞাস্য হোক, ঠিক কী ধরনের অসুখ রোগীর হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হ্যানিম্যানের চেয়ে বেশি উপকার আর কোনো একক ব্যক্তি করেননি। হ্যানিম্যান সাহেবের কীর্তির প্রতি তাঁর বিপরীতমুখী চিকিৎসাদর্শনের একজন শ্রেষ্ঠতম অনুসারীর পরম শ্রদ্ধার এই উক্তির পথ ধরেই জেনে নেওয়া যাক, চিকিৎসাপদ্ধতি ও চিকিৎসাদর্শন বিষয়ে হ্যানিম্যানসাহেব ঠিক কী বলেছিলেন। তাঁর সুবিখ্যাত অর্গ্যানন অফ মেডিসিন বই থেকে সরাসরি ইংরেজিতেই উদ্ধৃত করলাম। তার নীচে আমার নিজের মতো করে ভাবানুবাদের চেষ্টা রইল। (উদ্ধৃতির অংশগুলি (www.organonofmedicine.com ওয়েবসাইট থেকে গৃহীত, যে সাইটে অর্গ্যাননের পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংস্করণের সূত্রসমূহ এবং তদসংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে)।
সংক্ষিপ্ত নীতিকথন (Aphorism1) : The physician's high and only mission is to restore the sick to health, to cure, as it is termed.

চিকিৎসকের একমাত্র উচ্চাভিলাষ বা লক্ষ্য হওয়া উচিত, অসুস্থ মানুষকে সুস্থতায় ফেরানো অর্থাৎ নিরাময়।

Aphorism 2 : The ideal cure is rapid, gentle, permanent and removes the whole disease in the shortest, least harmful way.

আদর্শ নিরাময় হবে দ্রুত, এমন যা শরীরের পক্ষে মৃদু ও পীড়াদায়ক নয়, পাকাপাকি অসুখ সম্পূর্ণ সারানো হবে সবচেয়ে কম সময়ে এবং সবচেয়ে কম ক্ষতিকর পথে।

Aphorism 3 : If the physician understands what is curable in disease, and understands what is curative in medicines, and understands how to apply the medicines to the disease, and knows how to remove conditions which prevent the patient from getting well, he is a true physician.

প্রকৃত চিকিৎসক তিনিই, যিনি জানবেন অসুখের কতটুকু নিরাময়যোগ্য, ওষুধের কতটুকু নিরাময়ের সহায়ক, যিনি জানবেন, এই অসুখে ওষুধ প্রয়োগ করা হবে কী করে এবং যিনি বুঝবেন, অসুস্থ মানুষটি ঠিক কোন কারণে সুস্থ হয়ে উঠতে পারছেন না।

Aphorism 4 - He is likewise a preserver of health if he knows the things that derange health and cause disease, and how to remove them from persons in health.

একইসাথে চিকিৎসক মানুষের সুস্থতা রক্ষার্থে ব্রতী, যদি তিনি জানেন, কী কী কারণে একজন মানুষ সুস্থতা থেকে অসুস্থ হন, কী কী কারণে রোগ হয় এবং সেই কারণগুলো কীভাবে দূর করা যায়।

Aphorism 5 : Pay attention to the exciting cause AND the fundamental cause including the patient's character, activities, way of life, habits, etc.

চিকিৎসার জন্যে অসুস্থতার প্রাথমিক কারণ এবং আপাত-কারণ, দুটিই নজরে রাখুন — প্রাথমিক কারণ বলতে রোগীর চরিত্র, দৈনন্দিন জীবনযাপন, ক্রিয়াকলাপ, অভ্যেস ইত্যাদি সবকিছু।

Aphorism 6 : There is no need for metaphysical speculation. Diseases are the totality of the perceptible symptoms.

দার্শনিক তত্ত্ব নিষ্প্রয়োজন — রোগী এবং চিকিৎসক, দুইয়ের সামনে যে উপসর্গগুলি দৃশ্যমান, সেগুলো একত্রেই অসুখ।

Aphorism7 : To cure, you only need to treat the totality [NOT symptomatic palliation; a single symptom is not the disease.

নিরাময় করতে হলে, সমগ্রের চিকিৎসা হওয়া জরুরি। উপসর্গের উপশম কখনোই নিরাময় নয়, অসুখ বলতে একটিমাত্র উপসর্গ নয়।

একটু ঝালিয়ে নিতে চাইলে, প্রথম সাতখানি সূত্রে যে কথা বলা হয়েছে, তার মূল নির্যাস, চিকিৎসকের কর্তব্য উপসর্গ দেখে সমগ্র মানুষটিরই চিকিৎসা করা, তাঁকে নীরোগ করা আর যত দ্রুত সম্ভব আরোগ্যে ব্রতী হওয়া। উপসর্গ দেখে রোগনির্ণয়ের সময় চিকিৎসক মাথায় রাখবেন, রোগীর জীবনযাপন-অভ্যাস-চরিত্র ইত্যাদি আর আরোগ্যের লক্ষ্য হবে রোগের মূলগত নিরাময়, বা বলা ভালো, রোগের নির্মূল। যে চিকিৎসক যথার্থভাবে জানেন রোগের কতখানি নিরাময়যোগ্য, ওষুধ কতখানি কার্যকরী, আর জানেন অসুখ অনুসারে ওষুধের প্রয়োগবিধি, তিনিই সুচিকিৎসক। অসুস্থের চিকিৎসার পাশাপাশি সুস্থ মানুষের স্বাস্থ্য বজায় চিকিৎসকের ভূমিকার কথাও আলাদাভাবে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। কথাগুলোর যাথার্থ্য নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ, বোধহয় নেই। কথাগুলো চিরকালীন— ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট মাথায় রাখলেও, আবার স্বাস্থ্যব্যবস্থার বর্তমান ঘোলাজলেও — সবসময়েই তাৎপর্যপূর্ণ।

হ্যানিম্যানের কথাগুলোর প্রেক্ষিতটুকু ফিরে দেখা যাক। বর্তমান অ্যালোপ্যাথির তখন শৈশব। না, ঠিক হামাগুড়ি দেওয়ার শৈশব নয়, বলা চলে, টলমল করে হাঁটা শুরু করার দিন। তৎকালীন চিকিৎসার হালত কী ছিল, তার উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, রক্তক্ষরণ বা ব্লাডলেটিং সেই আমলের অন্যতম প্রধান চিকিৎসাপদ্ধতি। আবার তারই মধ্যে, ভেসালিয়াস-হার্ভের হাত ধরে প্রাপ্ত শারীরবৃত্ত-শারীরিক অন্তর্গঠনের প্রাথমিক পাঠ পেতে শুরু করে রোগের চিকিৎসা ক্রমশই সামগ্রিক মানুষ থেকে রোগগ্রস্ত প্রত্যঙ্গের দিকে সরে আসছে। অর্থাৎ, একদিকে চিকিৎসা হয়ে উঠছে নৈর্ব্যক্তিক আর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বিষয়ে উদাসীন, অন্যদিকে সেই চিকিৎসার কার্যকারিতা নিয়েও প্রচুর প্রশ্ন। তামার খনি অঞ্চলে মজুরদের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে তিতিবিরক্ত হ্যানিম্যান প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতির উপর বিশ্বাস হারালেন। আর, শুরু করলেন নিজস্ব চিকিৎসাপদ্ধতি, যা কিনা এক ভিন্ন চিকিৎসা দর্শনও বটে। যে দর্শনে খন্ড খন্ড করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নয়, চিকিৎসা হবে সমগ্র মানুষটিরই, আর সেই চিকিৎসায় ব্যবহৃত হবে ন্যূনতম ওষুধ।

লক্ষ্য করুন, হ্যানিম্যানের লেখা বইটির প্রথম নাম কিন্তু, অর্গানন অফ দ্য র‍্যাশানাল আর্ট অফ হিলিং। এইখানে র‍্যাশানাল কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ইদানিং তো হোমিওপ্যাথি থেকে যুক্তিটা হারিয়ে যাচ্ছে, তাই না ? যুক্তির কথা বা যুক্তির অভাবের কথা নিয়েই এই আলোচনা।

সে আলোচনায় ঢোকার আগে, মনে রাখা যাক, হোমিওপ্যাথির জনক হিসেবে অনেকে হ্যানিম্যানকে চিনলেও, এই চিকিৎসাব্যবস্থার শুরু কিন্তু হ্যানিমানের আগেই। ভিয়েনার আন্তন ভন স্টর্কের পথ ধরে এগিয়ে হ্যানিম্যান এই চিকিৎসাব্যবস্থাকে একটা সুসংহত রূপ দিয়েছিলেন। মনে রাখা যাক, হ্যানিম্যানের সেই চিকিৎসাপদ্ধতি ছিল তৎকালীন ইউরোপে চালু সাধারণ চিকিৎসাপদ্ধতির (যাকে হ্যানিম্যান দাগিয়ে দেবেন অ্যালোপ্যাথি বলে) থেকে প্রায় বিপরীত। কিন্তু, এসব কথা যত বেশি করে স্মরণ করা যায়, ততই বেশি বেশি করে প্রশ্নটা জাগে, প্রায় একক প্রয়াসে প্রচলিত চিকিৎসাব্যবস্থার বিপক্ষে গিয়ে নতুন ভাবনার যে বৈপ্লবিক দুঃসাহস, যে প্রয়াস বিপুল জনপ্রিয়তা পেতে থাকল কয়েক দশকের মধ্যেই, তা এই বিগত দুশো বছরে দমবন্ধ জলাশয়ে পরিণত হল কোন পথে!

ইতিহাস ছেড়ে এই একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে প্রশ্নটা নিশ্চয়ই প্রাসঙ্গিক, হোমিওপ্যাথি ওষুধের বিষয়ে মূল আপত্তির অন্যতম জায়গাটা দ্রবণে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিমাণে ওষুধ থাকার সুবাদে পুরো দ্রবণটিই প্রবল শক্তিশালী ওষুধে পরিণত হওয়ার যুক্তি— সেই তত্ত্ব এই দুশো বছরে বিজ্ঞানের এত উন্নতির পরেও কীভাবে অপরিবর্তিত থাকতে পারে ?

অনেকেই জানেন, হোমিও ওষুধ প্রস্তুতের সময় মূল একটি উপাদানকে উত্তরোত্তর লঘু দ্রবণে পরিণত করা হয়, দ্রবণে দশভাগের একভাগ ঔষধ-উপাদান থাকলে তা ১X, তাকে আরো দশগুণ লঘু করে একশোভাগের একভাগ

উপাদান থাকলে ২X আরো দশগুণ লঘু করলে ৩X ইত্যাদি। অর্থাৎ X-এর আগে সংখ্যাবাচক দুই-তিন-চার-পাঁচ ইত্যাদি দশের উপরের সূচক অর্থে — 7X শক্তির অর্থ এক কোটি ভাগে একভাগ ঔষধ-উপাদান। একইভাবে 1C-র অর্থ একশো ভাগে একভাগ ঔষধ-উপাদান - 2C-র অর্থ (১০০ x ১০০) দশহাজার ভাগে একভাগ ঔষধ-উপাদান ইত্যাদি ইত্যাদি।

এতে আপত্তির কিছু ছিল না কম ডোজে ওষুধ প্রয়োগ করে চিকিৎসা করতে চাইলে, সে কাজ কেউ করতেই পারেন। সমস্যা হল অন্যত্র, তাঁরা দাবি করতে শুরু করলেন, দ্রবণ যত লঘু হয়, অর্থাৎ দ্রবণে ওষুধের ভাগ যতই কমে আসে, ওষুধ ততই জোরদার ও শক্তিশালী হয়। কিন্তু, ওষুধের শক্তি 12C বা 24X-এর বেশি হওয়ার অর্থ একভাগ ওষুধ-উপাদান রয়েছে একের-পরে-চব্বিশটা-শূন্য পরিমাণ দ্রবণে — যাতে কিনা, অন্তত অ্যাভোগাড্রোর তত্ত্ব মানলে, এক লিটার দ্রবণে একটি ওষুধের অণুও থাকার সম্ভাবনা কম, আর আপনার হাতে ছোট্ট শিশিটিতে থাকা ওষুধের কথা তো বলাই বাহুল্য। এদিকে মুশকিল, অতি লঘু দ্রবণে ওষুধের অণুর উপস্থিতি বিষয়ে বা অনুপস্থিতি সত্ত্বেও গুণাগুণ বজায় থাকা নিয়ে আপনি যতোই নিশ্চয়তা দিতে চান, অ্যাভোগাড্রোর বিকল্প তত্ত্ব এই মুহূর্তে বাজারে সেভাবে নেই।

কিন্তু, একবিংশ শতকের পাঠককে মনে করানো যাক, আঠেরোশো সালে রসায়ন এমনধারা এগোতে পারেনি। অ্যাভোগাড্রো আর হ্যানিম্যান সমকালীন হলেও অ্যাভোগাড্রোর তত্ত্ব তখনও হাইপোথিসিস — সর্বজনস্বীকৃত নয়। কাজেই, এক লিটার জলে এক ফোঁটা ওষুধ ঢেলে খুব করে ঝাঁকালে, আর তার পরে তার মধ্যে আরো ক'লিটার বা কয়েকশো লিটার জল মেশালে, তার মধ্যে যে আর অণু-পরিমাণ ওষুধও থাকে না, এবং অণুর অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তামাম দ্রবণটিই যে অতীব শক্তিশালী ওষুধে পরিণত হতে পারে না, এই সরল সত্য বিজ্ঞান দিয়ে জানার সুযোগ হ্যানিম্যানের হয়নি। অনুমান করা কঠিন নয়, কার্যকারী ওষুধের অভাব আর "ভালো-করতে-না-পারো-খারাপ-কোরো নার" সনাতন গ্যালেন-হিপোক্রেটিয় নীতিই হ্যানিম্যানকে বাধ্য করেছিলো এরকম ভাবতে। কিন্তু, তার পর?

উইলিয়াম অসলার-এর কথায় ফিরি —

"No regular physician would ever admit that the homeopathic preparations, 'infinitesimals,' could do any good as direct curative agents; and yet it was perfectly certain that homeopaths lost no more of their patients than others. There was but one conclusion to draw - that most drugs had no effect whatever on the diseases for which they were administered."

অর্থাৎ, কোনো স্বাভাবিক চিকিৎসকই মানবেন না যে, হোমিও ওষুধ তাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ওষুধের পরিমাণ নিয়ে সরাসরি অসুখ সারানোর কাজে লাগতে পারে। কিন্তু, এও অনস্বীকার্য, (ইতিহাসের সেই সময়ে) অন্যান্য চিকিৎসাপদ্ধতির চাইতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় বেশি মানুষ মারা যেতেন না। এর থেকে যে সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হতে পারি, সে হল, অধিকাংশ (অ্যালোপ্যাথি) ওষুধ যে অসুখের জন্যে প্রয়োগ করা হত, অসুখ সারানোর ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ছিল নগণ্য।

অসলার-এর উক্তির প্রথম বাক্যটি আদৌ সত্য কি? হোমিওপ্যাথি ডাক্তারবাবুরা তো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঔষধকে ধন্বন্তরি বলে রীতিমতো বিশ্বাস করেন। হ্যানিম্যানের তত্ত্ব চালু হওয়ার পরে, মাঝের এই দুশো বছরে, সব মহাদেশেরই নদী দিয়ে তারপর বিস্তর জল গড়িয়ে গিয়েছে। বিজ্ঞানের সবকটি শাখার মতো চিকিৎসাবিজ্ঞানও এগিয়েছে অনেক এবং বিজ্ঞানের বাকি শাখাপ্রশাখার উন্নতি চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছে। অনিবার্য প্রশ্ন জাগে, দুশো বছর ধরে, হাজারে হাজারে হোমিওপ্যাথ কেন তাঁদের চিকিৎসাপদ্ধতিটিকে বিজ্ঞানের সূত্রে বাঁধতে চেষ্টা করলেন না? কেন বিজ্ঞানের নিত্যনতুন সত্যের আলোকে নিজেদের ভালোবাসার শাস্ত্রটিকে নতুন করে আবিষ্কার করার পরিশ্রমটুকু করলেন না? না, এই প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নেই।

হ্যানিম্যানসাহেব তো নিজেই নিজের কথাকে বেদবাক্য বলে ধরে থাকেন নি। তাঁর অর্গ্যানন প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮১০ সালে। জীবদ্দশাতে তিনি এর পরিমার্জন করেন বেশ কয়েকবার। শেষবার ১৮৪২ সালে। বহুবছর পরে প্রকাশিত হয় সেই ষষ্ঠ সংস্করণ — যেটি কিনা হ্যানিম্যান সাহেবের নিজেরই ভাষায় আঠারো মাসের পরিশ্রমের ফসল ও যথাসাধ্য নিখুঁত সংস্করণ। স্বাভাবিকভাবেই, প্রথম আর ষষ্ঠ সংস্করণের ফারাক বিস্তর। তাহলে, তাঁর অনুসারীরা, সেই অর্গ্যাননকেই অভ্রান্ত প্রায় বেদ-কোরাণতুল্য ধর্মগ্রন্থের সমতুল ধরে থেমে থাকলেন কেন? কেন প্রশ্ন করার, পরীক্ষা করার যুক্তিবোধ হোমিওপ্যাথি থেকে হারিয়ে গেল? বা,

আরো রূঢ় ভাষায় বললে, কেন হোমিওপ্যাথি থেকে মেধা বিদায় নিল?

হ্যাঁ, একটা কারণ নিশ্চয়ই অর্থাভাব। প্রাতিষ্ঠানিক নেকনজর থেকে হোমিওপ্যাথি চিরকালই বঞ্চিত। যদিও বিশ্বজুড়ে হোমিওপ্যাথি শিল্পের বার্ষিক টার্নওভারের অঙ্কটি কম কিছু নয় — কিন্তু, মডার্ন মেডিসিনের তুলনায় সে তো নস্যি! কিন্তু, বিনিয়োগের অভাব তো একমাত্র কারণ হতে পারে না। প্রতিষ্ঠানকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই যে চিকিৎসাপদ্ধতির উদ্ভব ও বিকাশ, সে যে প্রাতিষ্ঠানিক আনুকূল্য পাবে না, এ তো জানাই কথা। কিন্তু, সেই কারণে, নাকি সেই অভিমানে, হোমিওপ্যাথি বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মকানুনগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবে, এ কেমন কথা! একথা অনস্বীকার্য যে, বিগত শতকের শুরু থেকেই, সারা বিশ্ব জুড়েই, অ্যালোপ্যাথি ছাড়া অন্যান্য চিকিৎসা ব্যবস্থাকে দূরে সরানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। তার আগে পর্যন্ত, যেমন ধরুন মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে, সবকটি চিকিৎসাব্যবস্থাকে সমান গুরুত্ব দিয়েই পড়ানো হতো। আর চিকিৎসাশিক্ষা ছিলো, প্রকৃত অর্থেই ইন্টারডিসিপ্লিনারি। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, ক্যানসার চিকিৎসায় রেডিওথেরাপির সূচনা এক হোমিওপ্যাথি ছাত্রের হাতেই।

কিন্তু, ঊনবিংশ শতকের শেষে রকফেলার-কার্নেগীর প্রচুর পেট্রোরাসায়নিকজাত ওষুধ বিক্রির বাজার তৈরির জন্যে, মেডিকেল পাঠক্রমের "আধুনিকীকরণ" জরুরি হয়ে পড়ল। আব্রাহাম ফ্লেক্সনারের নেতৃত্বে ঢেলে সাজানো হল মেডিকেল শিক্ষাক্রম। একমাত্র অ্যালোপ্যাথি পেলো মডার্ন মেডিসিনের তকমা। বাকি সবাই দুয়োরানী। অবশ্য, এই ঘটনায় আমাদের অবাক হওয়া সাজে না। এর বহু আগেই, ব্রিটিশরাজ, পরিকল্পিতভাবেই আমাদের যুগযুগান্ত ধরে পরীক্ষিত চিকিৎসাব্যবস্থাকে ব্রাত্য করে অ্যালোপ্যাথি তথা মডার্ন মেডিসিনকেই ধ্রুব সত্য জ্ঞান করতে শিখিয়েছে। বিস্তারে সেই আলোচনা করার সুযোগ এ নিবন্ধে নেই — কিন্তু, বিজ্ঞানের একটি পথ ক্ষমতার অঙ্গ হয়ে উঠে বাকিদের কেমন করে প্রান্তিক করে দেয়, সে উদাহরণ বিজ্ঞানের ইতিহাসে অজস্র। মোটকথা, প্রাতিষ্ঠানিক আনুকূল্য ব্যতিরেকে, অর্থসংস্থানের অভাবে গবেষণা থেমে থাকলে বহতা নদীতুল্য চিকিৎসাপদ্ধতি মজা ডোবায় পরিণত হয়। আর মেধার জোগানও কমে যায়। এদেশের অতীত গৌরবের আয়ুর্বেদও সেই পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছে — হোমিওপ্যাথিও ব্যতিক্রম নয়। তবু, পুনরাবৃত্তিজনিত বিরক্তি উৎপাদনের ঝুঁকি নিয়েই বলা যাক, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত বা ইতিহাসগত কারণসমূহ তা নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু শুধুমাত্র সেটুকু নিয়ে পড়ে থাকলে, বা সেটিকেই অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ দিলে, মূলগত গলদের দিকটা প্রকাশ্যে আসে না। বিজ্ঞানসম্মত একটি চিকিৎসাপদ্ধতির সম্মান পেতে গেলে, বিজ্ঞানের অন্তত সাধারণ নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। হোমিওপ্যাথি সেই নিয়ম থেকে সরে আসছে না তো?

ধরুন, একটি চিকিৎসা আদৌ কোনো কাজ করে নাকি করে না, সেটা যাচাই করে দেখার পদ্ধতি ঠিক কী? এতদিনে আমরা জেনেছি, ওষুধে কোনো কার্যকরী উপাদান না থাকলেও রোজ একটি করে ক্যাপসুল খেলেও আপনি অনেকখানি সুস্থ বোধ করতে পারেন, স্রেফ একটি ওষুধ খাচ্ছেন এই শান্তিতেই — যাকে পরিভাষায় বলে, প্লাসিবো এফেক্ট। নতুন ওষুধ এলে, প্রথমেই যাচাই করে দেখার দস্তুর, আদপেই ওষুধটা প্লাসিবো এফেক্টের চেয়ে বেশি কার্যকারী কিনা। এই যাচাইয়ের সবচেয়ে বেশী স্বীকৃত পদ্ধতি র‍্যাণ্ডমাইজড কন্ট্রোলড ট্রায়াল। রোগীদের দুভাগে ভাগ করা হয় — একটি দল পান নতুন ওষুধ, অন্য দল প্লাসিবো। সাধারণত বিশ্লেষণের আগে ধরে নেওয়া হয়, এই দুই দলের ক্ষেত্রে ফলাফল শেষমেশ একই দাঁড়াবে, যাকে বলা হয় নাল হাইপোথিসিস। বিশ্লেষণের শেষে যদি দেখা যায় সেই নাল হাইপোথিসিস ভুল, অর্থাৎ প্রথম দলের রোগীরা বেশি তাড়াতাড়ি বা বেশি ভালো করে সুস্থ হচ্ছেন, তাহলে বলা যায়, ওষুধটা কাজের। হ্যাঁ, আমিও মানি, র‍্যান্ডমাইজড কন্ট্রোলড ট্রায়াল, ওরফে আরসিটি বাদ দিয়ে জগত মিথ্যা, এও এক মৌলবাদ। কিন্তু, দুর্ভাগ্যজনক সত্যিটা হল, এই মুহূর্তে এর চাইতে উপযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিও কিছু নেই। আরসিটি-র যাথার্থ্য নিয়ে তাত্ত্বিক বা দার্শনিক অনেক বিতর্কের অবকাশ রয়েছে, বিজ্ঞানের যে কোনো পদ্ধতি নিয়েই থাকে সেই ভিন্নমত। কিন্তু, আরসিটি-র যে সমস্যাটা আমাদের কাছে প্রায় জাজ্বল্যমান, সেটি মুখ্যত প্রায়োগিক। মাল্টিসেন্ট্রিক আরসিটি, অন্তত এখন যে মডেলে চলে, সে বেশ জটিল ও ব্যয়বহুল পদ্ধতি, বর্তমান পরিস্থিতিতে যার নিয়ন্ত্রণ অনেকাংশেই বৃহৎ বহুজাতিক পুঁজির হাতে। অতএব, আরসিটি এবং তদনুসারী এভিডেন্স-বেসড মেডিসিন-কে ব্যবহার করে কর্পোরেট পুঁজি চিকিৎসাব্যবস্থাটাকেই মুনাফা অর্জনের চারণক্ষেত্রে পরিণত করেছে। তথাকথিত প্রমাণনির্ভর চিকিৎসার নামে চিকিৎসার প্রতি অংশে আজ

ওষুধ কোম্পানির আধিপত্য প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা পাচ্ছে। এভিডেন্স-বেসড হওয়ার নামে চিকিৎসাই হয়ে উঠছে উত্তরোত্তর নৈর্ব্যক্তিক, আর এই পথে চলতে থাকলে কোম্পানির মুনাফা ভিন্ন অপর কোনো উন্নতির সম্ভাবনা নেই। এমনকি, এই নৈর্ব্যক্তিক মুনাফামুখী চিকিৎসাব্যবস্থায় ব্যক্তি-চিকিৎসকের মানবিক স্পর্শটুকুও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠা স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। বিকল্প মডেলের খোঁজ আমাদেরও প্রয়োজন। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষকরা ও চিকিৎসকরা সেই সমস্যা নিয়ে বারবার সোচ্চার হচ্ছেন। হোমিওপ্যাথির অবস্থান, স্বাভাবিকভাবেই, এই বহুজাতিক পুঁজির বাইরে — হোমিওপ্যাথি অনেক বেশী করে অসুস্থ মানুষটির সাথে খুঁটিয়ে কথাবার্তার কথা বলে, তাঁদের চিকিৎসাপ্রকরণ আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের চেয়ে বেশি সংলাপনির্ভর — অন্তত অনেকাংশে তো বটেই। কিন্তু, পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিতে হোমিওপ্যাথরা কীভাবে ভাবছেন? বিকল্প মডেলের দিশা কি তাঁদের হাতে আদৌ রয়েছে?

বিজ্ঞানের অপব্যবহার বা সঙ্কীর্ণ স্বার্থে বিজ্ঞানের ব্যবহারের বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিরোধ হয়ে দাঁড়াতে পারে একমাত্র বিজ্ঞান-ই, সমাজমুখী ও জনকল্যাণের আদর্শে দীক্ষিত বিজ্ঞান। হোমিওপ্যাথির অবস্থান সেক্ষেত্রে ঠিক কী? বিজ্ঞানের অপব্যবহারের উত্তর ল্যাজামুড়োসমেত বিজ্ঞানকে বর্জন করার মধ্যে দিয়ে খুঁজে পাওয়ার আশা কতটুকু?

নাঃ, কথায় কথায় অনেকদূর এগিয়ে এসেছি। আবারও একটু হ্যানিম্যান সাহেবের অর্গ্যাননে ফিরে আসা যাক।

Aphorism 22 : But as nothing is to be observed in diseases that must be removed in order to change them into health besides the totality of their signs and symptoms, and likewise medicines can show nothing curative besides their tendency to produce morbid symptoms in healthy persons and to remove them in diseased persons; it follows, on the one hand, that medicines only become remedies and capable of annihilating disease, because the medicinal substance, by exciting certain effects and symptoms, that is to say, by producing a certain artificial morbid state, removes and abrogates the symptoms already present, to wit, the natural morbid state we wish to cure. On the other hand, it follows that, for the totality of the symptoms of the disease to be cured– a medicine must be sought which (according as experience shall prove whether the morbid symptoms are most readily, certainly, and permanently removed and changed into health by similar or opposite medicinal symptoms) have the greatest tendency to produce similar or opposite symptoms.

ভাবানুবাদ করলে দাঁড়ায়, অসুখ থেকে সুস্থতায় ফেরানোর অর্থ অসুখের সামগ্রিক উপসর্গ দূর করা — এর বেশি কিছু নয়। তেমনভাবেই, ওষুধ বলতে এমন উপাদান, যা সুস্থ মানুষের দেহে উপসর্গ তৈরি করবে এবং অসুস্থ মানুষের দেহ থেকে সেই উপসর্গ দূর করতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ, এককথায় বলতে হলে, ওষুধ তখনই কার্যকর, যখন তা সুস্থ মানুষের দেহে কৃত্রিমভাবে সেই উপসর্গ তৈরি করতে পারবে, যে উপসর্গ স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক পথে এসে আরেকজন মানুষের ক্ষেত্রে অসুস্থতার জন্ম দেয়। আরেকভাবে দেখতে গেলে বলতে হয়, কোনো অসুখের (যা কিনা কিছু উপসর্গের সমষ্টির বেশি আর কিছু নয়) চিকিৎসার জন্যে যদি ওষুধ খুঁজতে হয়, তাহলে খুঁজতে হবে এমন উপাদান, যা সুস্থ মানুষের শরীরে অনুরূপ উপসর্গের জন্ম দিতে পারে।

একবিংশ শতকে একটু হাস্যকর শোনালেও, সেই সময়ের পক্ষে কথাটা খুব নতুন কিছু নয়। হিপোক্রেটিস প্রায় একই কথা বলেছিলেন — "By similar things a disease is produced and through the application of the like is cured" — অর্থাৎ, যে উপাদান সুস্থ মানুষের দেহে আলোচ্য অসুখ তৈরি করতে পারবে, সেই একই উপাদান অসুস্থ মানুষের অসুখ সারিয়ে তুলবে। সমস্যাটা এই, হিপোক্রেটিস কথাটা বলেছিলেন খ্রিস্টজন্মের চারশো বছর আগে আর হ্যানিম্যান বললেন হিপোক্রেটিসের দুহাজার বছরেরও বেশি সময় বাদে — যার মধ্যে চিকিৎসার পিছনে যে অন্তর্নিহিত বিজ্ঞান, তা এগিয়ে গিয়েছে অনেকটা, যদিও কার্যকরী চিকিৎসার খোঁজ তখনও সেভাবে মেলেনি।

কিন্তু, উনবিংশ শতকের চিকিৎসাদর্শনেও একই উপসর্গ তৈরি করে নিরাময় আবিষ্কারের চেষ্টাটা, অর্থাৎ এই লাইক-কিওর্স-লাইক তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা ছিল। ঠিক কোন পথে এগিয়ে হ্যানিম্যানের সমকালীন এডওয়ার্ড জেনার গুটিবসন্তের টীকা তৈরি করেছিলেন, এই মুহূর্তে বসে তা অনুমান করা কঠিন — কিন্তু, সেই টীকা আবিষ্কারের পিছনে যে দর্শন শেষমেশ কার্যকরী হয়েছিল, তার সাথে হ্যানিম্যানের ভাবনার মিল ছিল লক্ষণীয়। যদিও, জেনারের টীকা আবিষ্কার আর হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথির তত্ত্বের মধ্যে একটা বড়সড় ফারাক মনে রাখতে হবে — জেনার

খুঁজছিলেন প্রতিষেধক আর হ্যানিম্যান বলছিলেন ওষুধের কথা। রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর উপাদান বা আক্রমণক্ষমতা-হ্রস্বীকৃত জীবাণু দিয়ে রোগের প্রতিষেধকের অনুসন্ধান এখন বিজ্ঞান-স্বীকৃত। অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডির খবর মেলার পরে সে পদ্ধতির বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যাও মিলেছে। কিন্তু, রোগসৃষ্টিকারী উপাদান বা তার সমতুল্য পদার্থ (হোমিওপ্যাথির বন্ধুরা বারবার এই same আর similar-এর গুরুত্বপূর্ণ ফারাকটুকু মনে করিয়ে দিয়েছেন) দিয়ে সেই রোগের ওষুধ খুঁজে ফেলার সাধারণ পদ্ধতির পক্ষে প্রমাণ বা বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি, কোনোটিই মেলেনি। জেনার যখন গুটিবসন্তের টীকা আবিষ্কার করলেন, সেই আবিষ্কারের সাথে স্কারলেট ফিভারে নিজের বেলাডোনা প্রয়োগের প্রসঙ্গ মিলিয়ে Cure and Prevention of Scarlet Fever বইয়ের ভূমিকায় উজ্জীবিত হ্যানিম্যানম্যান লেখেন—

It is the only in accordance with my well known maxim (the new principle) that small-pox, to give one example from among many, had an important prophylactic in the cow-pox, which is an exanthematous disease, whose pustules break out after the sixth day of inoculation, with pain and swelling of the axillary glands, pain the back and loins, and fever, and surrounded by an erythematous inflammation - that is to say, constitute altogether a disease very similar to variola. And in like manner, medicine which causes symptoms so similar to those of the invasion of scarlet-fever, as belledona does, must be one of the best preventive remedies for this children's pestilence.'

হ্যানিম্যানের কথাটুকু সংক্ষেপে অনুবাদ করতে গেলে দাঁড়ায় — এই (লাইক-কিওর্স-লাইক) তত্ত্বের (অর্থাৎ সুস্থ দেহে সম-উপসর্গ উৎপাদনে সক্ষম বস্তুই অসুস্থের ক্ষেত্রে ওষুধ) সমর্থনে দেখানো যেতে পারে, গুটিবসন্তের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষেধক পাওয়া গেল কাউ-পক্স-এর হাত ধরে — কেননা, অসুখ দুটোর উপসর্গ খুব কাছাকাছি। ঠিক একইভাবে, যে ওষুধ সুস্থ মানুষের স্কারলেট-ফিভারের মত উপসর্গ তৈরি করবে, যেমন বেলাডোনা করে থাকে — তা এই অসুখের চিকিৎসার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা নেবে। মাথায় রাখা যাক, হ্যানিম্যান এই কথা যখন লিখছেন, অর্গ্যাননের প্রথম সংস্করণ বাজারে আসতে তখনও বাকি প্রায় এক দশক। অতএব, জেনারের সাফল্য হ্যানিম্যানকে নিজের তত্ত্বের ব্যাপারে বাড়তি আস্থা জুগিয়েছিল, এটুকু নিশ্চিত।

কথাটা আগেও বলেছি, আবারও মনে করিয়ে দিই - হ্যানিম্যান ইতিহাসের একজন মানুষ এবং যে কোনো ঐতিহাসিক চরিত্রের মতোই তিনিও তাঁর সময়ের ফসল, তাঁর সাফল্য ও ত্রুটিবিচ্যুতি উভয়ই সেই সময়ের প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশে — তাঁর তত্ত্বের মূল উপপাদ্যসমূহও দোষগুণ মিলিয়ে তা-ই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা চিন্তাপদ্ধতিও, সমকালীন চিন্তার যে গ্রাহ্য প্যারাডাইম, তার বাইরে চট করে যেতে পারে না। জেনারের আবিষ্কার প্রসঙ্গে হ্যানিমান যত উচ্ছ্বসিতই হোন না কেন, পুনরুল্লেখ মার্জনা করবেন, অসুখের প্রতিষেধক ও অসুখের চিকিৎসা একই পথে কাজ করে না। প্রতিষেধক সুস্থ মানুষের জন্যে প্রযোজ্য - ওষুধ অসুস্থদের জন্য। মুখে খাওয়ানোর পোলিওর টীকার মাধ্যমে শরীরে যায় অসুখ সৃষ্টিতে অংশত অক্ষম পোলিও ভাইরাস (হোমিও বন্ধুরা মনে রাখুন, হুবহু পোলিও ভাইরাস নয়, রোগ সৃষ্টির ক্ষমতা হ্রস্বীকৃত ভাইরাস— অর্থাৎ, তাঁদের মনপসন্দ লব্জে, same নয়, similar)। কিন্তু, পোলিও রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব নেই। তবু, সময়ের প্রেক্ষিত ও আনুষঙ্গিক বিজ্ঞানের তৎকালীন শৈশবদশার কথা মাথায় রেখে, হ্যানিম্যানকে নিয়ে আমার সমস্যা নয় — আমার অনুযোগ তাঁদের নিয়েই, যাঁরা সেই ঐতিহাসিক তত্ত্বকে সমকালে অপরিবর্তিত অবস্থায় প্রয়োগ করে চলেছেন।

তত্ত্বকে এরূপ অপরিবর্তনীয় ধরে এগোনোর একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতার দিকে চোখ রাখা যাক। হ্যানিম্যানের অর্গ্যাননের কয়েক দশকের মধ্যেই লুই পাস্তুর এনে ফেললেন তাঁর জার্ম থিওরি অফ ডিজিজ — অসুখের জীবাণু তত্ত্ব; যে তত্ত্ব অনুসারে রোগের পিছনে দায়ী বহিরাগত জীবাণু। হ্যাঁ, এই তত্ত্বের কিছু সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং পাইকারি হারে এ তত্ত্বের প্রয়োগ স্বাস্থ্য ও সুস্থতার ব্যাপারটাকে আক্রমণাত্মক চিকিৎসার সাথে একাকার করে ফেলতে সহায়ক হয়েছে। কিন্তু, সে বিষয়ে বিশদ আলোচনার পরিসর এই নিবন্ধে নেই। মোটের উপর একথা অনস্বীকার্য, চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে জার্ম থিওরির মতো বৈপ্লবিক ও দীর্ঘমেয়াদে প্রভাবশালী তত্ত্ব খুব কমই এসেছে। হ্যানিম্যানের উত্তরসূরীরা এই তত্ত্বের প্রেক্ষিতে নিজেদের চিকিৎসাদর্শনের ঠিক কী বদল এনেছিলেন? বা কী বদল এনেছেন? উনিশশো শতকের শেষদিকেই জার্ম থিওরিকে আরো সংহত চেহারা দিলেন রবার্ট কখ। জীবাণুঘটিত অসুখের ক্ষেত্রে তাঁর চারখানি বিখ্যাত পসচুলেটস - অর্থাৎ অসুখ জীবাণুঘটিত কিনা, তা প্রমাণের ক্ষেত্রে চারটি পূর্বশর্ত - বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায় —

১. জীবাণুঘটিত অসুখের ক্ষেত্রে অসুস্থ মানুষের শরীরে জীবাণু পাওয়া যেতে হবে এবং সুস্থ মানুষের দেহে সেই জীবাণু পাওয়া যাবে না।

২. অসুস্থ মানুষের শরীর থেকে সেই জীবাণুকে আলাদা করা যাবে এবং গবেষণাগারে কৃত্রিম মাধ্যমে (artificial culture) সে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি ঘটানো সম্ভবপর হবে।

৩. কৃত্রিম মাধ্যমে বংশবিস্তারের পর সেই জীবাণু সুস্থ মানুষের দেহে প্রবেশ করানো হলে, সেই সুস্থ মানুষটিও একই রোগে আক্রান্ত হবেন।

৪. কৃত্রিম উপায়ে সংক্রামিত মানুষটির দেহ থেকে আবারও আলাদা করা যাবে এবং সেই জীবাণুকে পুনরায় গবেষণাগারের কৃত্রিম মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করানো সম্ভবপর হবে, এই দফায় বংশবৃদ্ধি করা জীবাণু ও প্রাথমিকভাবে যে জীবাণু নিয়ে কাজ শুরু হয়েছিল, দুটি অভিন্ন হতে হবে।

এই তত্ত্বকে মান্যতা দিতে হলে হ্যানিম্যানের মূলগত বক্তব্য কোথায় দাঁড়ায়? ধরুন, কখ-এর তৃতীয় উপপাদ্য মানতে চাইলে? অর্থাৎ, সুস্থ মানুষের দেহে অসুখ ও তৎসংক্রান্ত উপসর্গ সৃষ্টির সেরা ও সরলতম পথ তো তাঁর শরীরে সেই রোগের জীবাণু ঢুকিয়ে দেওয়া। তাহলে কি সংক্রামিত ব্যক্তির শরীরেও আরো খানিকটা জীবাণু ঢুকিয়ে দেওয়া কার্যকারী নিরাময়ের পথ হিসেবে গণ্য হবে? জীবিত ব্যাকটেরিয়াকে ঔষধ-উপাদান হিসেবে মেনে নিতে আপত্তি থাকলে, আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক — ধরুন খাদ্যে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত মানুষের ক্ষেত্রে সেই টক্সিন-যুক্ত খাদ্য আরো কিছুটা দেওয়া গেলে তিনি কি সুস্থ হয়ে উঠবেন (কেননা, সেই খাদ্য সুস্থ মানুষকে খাওয়ানো গেলে তাঁরও বমি-পায়খানা ইত্যকার উপসর্গ নিশ্চিত)? অবশ্যই আমি হোমিওপ্যাথি ডাক্তারবাবুদের same ও similar -এর প্রভেদ শিরোধার্য করছি (যদিও similar-এ কেন কাজ হবে আর same-এ কেন হবে না, সেকথা কোনো হোমিওপ্যাথ বন্ধুই আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন নি) এবং ব্যাপারটাকে আমি এঁড়ে তর্কের পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাইছি না — কিন্তু, টক্সিনের পরিবর্তে ঠিক একইরকম কার্যকরী উপাদান দিয়ে কীভাবে অসুখের সুরাহা মিলতে পারে, তার যুক্তিটুকু তো হোমিওপ্যাথরা ব্যাখ্যা করুন, প্লীজ।

জার্ম থিওরির পরবর্তী সময়ে লাইক-কিওর্স-লাইক-এর তত্ত্ব কি একইভাবে বিশ্বাসযোগ্য থাকতে পারে? এ তত্ত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজের তত্ত্বের সমর্থনে যুক্তি সাজানোর সুযোগ হ্যানিম্যান পাননি - কেননা, জার্ম থিওরি সর্বজনগ্রাহ্য হওয়ার আগেই আগেই তিনি মারা গিয়েছেন। কিন্তু, গত ১২৫ বছর ধরে হোমিওপ্যাথির গবেষকেরা কী বলছেন?

হোমিও ওষুধের কার্যকারিতা যাচাই হয় সুস্থ মানুষের দেহে, যার প্রথাগত নাম প্রুভিং। সরল কথায় ব্যাখ্যা করতে হলে, এই প্রুভিং-এ সুস্থ মানুষের দেহে ওষুধ প্রয়োগ করে দেখা হয়, তা অসুখের তুল্য উপসর্গ সৃষ্টি করতে পারছে কিনা,পুনরায় মনে করানো নিষ্প্রয়োজন, হোমিওপ্যাথির দর্শন মানলে, যে ওষুধ সুস্থ দেহে উপসর্গ সৃষ্টিতে সক্ষম, সেই ওষুধ অসুস্থের শরীর থেকে অনুরূপ উপসর্গ দূর করতে অবশ্যই কার্যকর — স্বভাবতই, অসুস্থ শরীরে কার্যকারিতা যাচাই করার প্রয়োজনীয়তা আলাদাভাবে থাকে না।

দ্বিতীয়ত, একই উপসর্গের সমষ্টি অর্থাৎ একই ব্যাধির ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিতে সবসময় যে একই ঔষধ প্রযোজ্য হবে, এমন কথা নেই। হ্যানিম্যানের কথা মনে রাখুন, রোগীর কী অসুখ হয়েছে জানার চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঠিক কী ধরনের মানুষটির অসুখ হয়েছে। কাজেই, ক্লিনিকাল ট্রায়ালে যেমন হয়, অসুস্থ মানুষদের দুভাগে ভাগ করে একদল একই ওষুধ পাবেন, আরেকদল আরেকপ্রকার ওষুধ পাবেন (অথবা কোনো ওষুধই পাবেন না — প্লাসিবো-কন্ট্রোলড ট্রায়াল), ঠিক সেই পদ্ধতি একইভাবে অনুসরণ করা হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রে মুশকিল। যদিও, আরসিটি-র বিপক্ষে তাঁদের এই যুক্তি মানতে হলে, একদল মানুষের উপর প্রযুক্ত প্রুভিং-এর তথ্য কীভাবে সর্বজনীন হয়ে উঠবে (হ্যাঁ, প্রাথমিকভাবে যেকোনো ওষুধই তাই — তার পরে বিচার করা হয়, সে তালিকা থেকে কোনটি আপনার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত), সে নিয়েও প্রশ্ন উঠে যায়। তাহলে, তাঁদের চিকিৎসা যে সত্যিসত্যিই কার্যকারী, হোমিওপ্যাথির ডাক্তারবাবুরা সেটা ঠিক কীভাবে প্রমাণ করবেন?

সচরাচর তাঁরা ব্যক্তি-চিকিৎসকের অভিজ্ঞতার উপর আস্থা রাখেন, অর্থাৎ একইধরণের রোগীর ক্ষেত্রে সে ওষুধ প্রয়োগ করে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রথিতযশা হোমিওপ্যাথরা ঠিক কীধরনের কার্যকারিতা লক্ষ্য করেছেন, সেই লিপিবদ্ধ অভিজ্ঞতার সমষ্টি। সমস্যা হল, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সুদীর্ঘ ও তিক্ত অভিজ্ঞতা বলে, ব্যক্তি চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা, সে যত প্রগাঢ়ই হোক না কেন, তার সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং তা প্রায়শই অনির্ভরযোগ্য। এই শতকে চিকিৎসার পক্ষে প্রমাণ হিসেবে ব্যক্তি-চিকিৎসকের অভিজ্ঞতার. কদর বেশ কমেছে। হোমিওপ্যাথির ডাক্তারবাবুদের চলার পথটি ঠিক কী হবে?

আজ যখন বিশ্বজুড়ে একের পর এক ক্লিনিকাল ট্রায়াল এবং সেই ট্রায়ালের তথ্য জুড়ে মেটা-অ্যানালিসিস থেকে বলা হচ্ছে, প্লাসিবোর (যাকে সান্ত্বনা-চিকিৎসা বলা যেতে পারে) চাইতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বাড়তি কোনো সুবিধেই নেই ; যখন বিভিন্ন দেশে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকে ভিত্তিহীন ও অকার্যকারী বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তখন হোমিওপ্যাথি ডাক্তারবাবুদেরই দায়িত্ব ও নৈতিক কর্তব্য, ঠিক কোন পথে তাঁদের চিকিৎসার নৈর্ব্যক্তিক কার্যকারিতা যাচাই করা যায়, সে বিষয়ে আরো গভীরে গিয়ে ভাবা এবং তদনুযায়ী যাচাই-লব্ধ তথ্য সর্বসমক্ষে পেশ করা যায়।

পুনরায় উল্লেখ করা যাক, হ্যানিম্যানসাহেবের তত্ত্ব এক দফায় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়নি, অর্গ্যাননের প্রথম সংস্করণের সাথে তো বটেই, এমনকি পঞ্চম সংস্করণের সাথেও ষষ্ঠের ফারাক অনেক। অর্থাৎ, সেই সময়ে দাঁড়িয়ে, নিজ-অভিজ্ঞতা ও সমকালীন ভাবনাচিন্তার সাথে তাল মিলিয়ে হ্যানিম্যান নিজের চিন্তাভাবনারও ঘষামাজা করে চলেছিলেন। কিন্তু, সেই সংস্করণের প্রকাশের পর একটি শতাব্দী পার হয়ে গেল, হ্যানিম্যানের তত্ত্বের নতুন বিশ্লেষণের প্রয়াস কিছু কিছু হলেও তত্ত্বটিরই স্থানে আরো আধুনিক তত্ত্বের কথা এখনও কেউ ভেবে উঠতে পারলেন না — কেন? বিশেষত, যখন একথা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত, যে, বিজ্ঞানের জগতে স্থির অবস্থান বলে কিছু হয় না, হয় সময়ের সাথে সাথে এগিয়ে চলা, উন্নত হয়ে ওঠা - নচেৎ পিছিয়ে পড়া।

এই লেখায় বারবারই আসছে যাঁর প্রসঙ্গ, যিনি আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব হয়েও হ্যানিম্যানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন — সেই উইলিয়াম অসলার-এর কথা আবারও শোনা যাক- "It is not as if our homeopathic brothers are asleep; far from it, they are awake (many of them at any rate) to the importance of the scientific study of disease."

অর্থাৎ, এমন নয় যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকরা ঘুমোচ্ছেন। তাঁরা, অন্তত তাঁদের বড় একটা অংশ তো বটেই, তাঁরা অসুখবিসুখের বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন।

শুনতে ভালো লাগলেও ব্যাপারটা ঠিক তেমনই দাঁড়াচ্ছে কি? হ্যানিম্যানের সময় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিমাণের ওষুধ, যাকে বলা যায় প্রায় —অসীম লঘুতার (infinitesimal dilution) দ্রবণ ব্যবহারের পিছনে, অনুমান করা যায়, মুখ্য প্রেক্ষিত ছিল সেসময়ের কার্যকরী ওষুধের অভাব এবং ওষুধের ভালোর চাইতে খারাপ করার প্রবণতা। মাঝের এই দুশো বছরে রসায়ন ও শরীরবিজ্ঞানের উন্নতি চমকপ্রদ — মলিকিউলার কেমিস্ট্রি, মলিকিউলার বায়োলজি জন্ম নিয়েছে হ্যানিম্যানের অনেক পরে, ভূমিষ্ঠ হয়ে এগিয়েও গিয়েছে অনেক অনেক গুণ। সেই প্রেক্ষিত ব্যবহার করে তাঁরা তাঁদের এই প্রায়-অসীম-লঘুতার তত্ত্ব নিয়ে আরেকবার ভেবে দেখবেন না!

সমস্যা এই, হোমিওপ্যাথি ডাক্তারবাবুরা ধরেই নিয়েছেন, হ্যানিম্যান অভ্রান্ত। কাজ যদি কিছু পড়ে থাকে, সে ওই তত্ত্বের পক্ষে নতুন ও যুগোপযোগী ব্যাখ্যা খাড়া করা। অতএব, তাঁরা কোয়ার্ক তত্ত্ব বা কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে অংশবিশেষ খাবলে হোমিওপ্যাথির পক্ষে যুক্তি সাজাতে চাইছেন। যেমন ধরুন, পরমাণুর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণাসমূহ আচরণ অনেকসময় অপর কণার উপস্থিতি ও অনুপূরক আচরণের উপর নির্ভর করে — এবং ক্ষেত্রবিশেষে কণাসমূহের বিশেষ কিছু ধর্ম ও নির্ভরশীলতা, যেমন স্পিন, দুটি কণাকে পরস্পরের থেকে দূরে সরিয়ে নিলেও অপরিবর্তিত থাকে। সেই উদাহরণ দেখিয়ে অনেকে বলতে চাইছেন, একইভাবে, প্রায়-অসীম-লঘু দ্রবণে দ্রাব্যের অণুর অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তার স্মৃতি রয়ে যায়। বিশ্বাস করুন, এবম্বিধ যুক্তিক্রমের সাথে পুষ্পকরথ বা গণেশরূপ দেখিয়ে বৈদিক যুগে বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রমাণ দাখিলের প্রয়াসের ফারাক নেই। নেহাত তর্কের খাতিরে তাঁদের যুক্তি মেনে নিতে চাইলেও পাল্টা প্রশ্ন থাকেই, দ্রাব্যের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিমাণের উপস্থিতি যদিও বা স্মৃতির সুবাদে দ্রবণটিকেই দ্রাব্যের ধর্মানুসারী করে তোলে। তাহলে, দ্রাব্যের উপস্থিতি যত কমবে (বা দ্রাব্য এমনকি অনুপস্থিত হয়ে গেলেও) দ্রবণটি ততই জোরালোভাবে দ্রাব্যের ধর্ম নিতে থাকবে কেন? যাঁরা হোমিওপ্যাথির সাথে ন্যানোকেমিস্ট্রিকে এক করে দেখাতে চান, তাঁদের ক্ষেত্রেও একটাই কথা, উপাদানের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তার স্মৃতির দ্বারা শারীরবৃত্তীয় কার্যসিদ্ধির আশা কিছু কিছু আধ্যাত্মিক দর্শনে চললেও চলতে পারে — বিজ্ঞান বলে চালানো মুশকিল।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান বা মডার্ন মেডিসিন বা অ্যালোপ্যাথি, যে নামেই ডাকুন না কেন, তার সাথে হোমিওপ্যাথির মূলগত প্রভেদ রয়েছে — সে কথা মেনে নিতে আপত্তি নেই। কিন্তু, সমকালীন রসায়ন-পদার্থবিদ্যা-গণিতের নিয়মকানুনকে অস্বীকার করে

প্রায়-অসীম-লঘু দ্রবণকে অসম্ভব শক্তিশালী ওষুধ বলে চালাতে গেলে সে চিকিৎসাদর্শনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন উঠে যায়, উঠতে বাধ্য।

মাথায় রাখা যাক, ওষুধ মাত্রেই একটি রাসায়নিক পদার্থমাত্র— হ্যাঁ, ভেষজ উপাদানও কিছু রাসায়নিকের সমষ্টিই। সে ওষুধের কিছু রাসায়নিক ধর্ম থাকবে, মানবদেহে ওষুধটির ক্রিয়া এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সাথে অনেকাংশে থাকবে সেই রাসায়নিক ধর্মের সংযোগ। মানবদেহে সে ওষুধের ক্রিয়া কেমন দাঁড়াতে পারে, তা যাচাই করার পথ দুটি - এক, গবেষণাগারে কৃত্রিম পরিবেশে (উদাহরণ - culture media) - দুই, মনুষ্যেতর প্রাণীদেহে (ইঁদুর বা গিনিপিগ) বা মানবদেহে। এই দুই পরীক্ষাপদ্ধতির সীমাবদ্ধতা, তাদের ফলাফল সবসময় একই দাঁড়ায় না বা কৃত্রিম মাধ্যমের ফলাফল বা গিনিপিগের শরীরে ওষুধের ক্রিয়ার অনুরূপ ফলাফল মানবদেহে সর্বদা পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু, পরীক্ষাগারে ওষুধের রাসায়নিক ধর্মের ক্ষেত্রে সে সমস্যা নেই। একটি নির্দিষ্ট রাসায়নিক যৌগের সাথে আরেকটি যৌগের বিক্রিয়া ও তা থেকে পরীক্ষালব্ধ তথ্য সর্বদাই একই হবে, যদি পরীক্ষাটি সঠিক পথে করা হয়।

কাজেই, প্রায়-অসীম-লঘুতার দ্রবণ কার শরীরে কাজ করবে আর কার শরীরে করবে না, সে বোঝার চাইতে ঢের সহজ সে দ্রবণের রাসায়নিক বিশ্লেষণ — ওষুধের গুণাগুণ অর্থে কিছু রাসায়নিক ধর্ম। রাসায়নিক ধর্মকে শরীরে ওষুধের ক্রিয়াকলাপের প্রতিনিধি বা সারোগেট মার্কার হিসেবে মেপে দেখাই যায় রাসায়নিক ধর্মের উপর নির্ভর করে ওষুধটি শরীরে উপযুক্ত অংশে পৌঁছাতে পারবে কিনা বা বেশিক্ষণ ধরে শরীরে থেকে বাড়াবাড়ি রকমের কাজ করতে গিয়ে উল্টো বিপত্তি করবে কিনা। কাজেই, ঔষধ-উপাদানের একটি অণুর উপস্থিতি ছাড়া বা খুব কম পরিমাণে দ্রাবকের উপস্থিতিতেই সমগ্র দ্রবণটি সেই উপাদানের ধর্ম অনুসারে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম কিনা, সে তো রাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমেই যাচাই করে দেখা সম্ভব। অর্থাৎ, একটি ওষুধ খাওয়ার পরে রক্তে সে ওষুধের মুখ্য উপাদান বা তার বিক্রিয়াজাত উপাদান উপস্থিত কিনা, সে তো রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমেই ধরে ফেলা যায়। সে পরীক্ষায় প্রত্যাশানুরূপ ফল না পেলে, প্রায়-অসীম লঘুতার তত্ত্ব (law of infinitesimal dilution) অবৈজ্ঞানিক — তাই না?

এ নিবন্ধের একেবারেই শুরুতে বিজ্ঞানের দর্শন বিষয়ে কার্ল পপারের নাম উল্লেখ করেছিলাম। বলেছিলাম, পপারের ফলসিফায়েবিলিটিকে সিদ্ধ ধরেই বিতর্কে অংশগ্রহণ করছি। সে তত্ত্বের মূল কথা, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সেটাই, যাকে ভুল প্রমাণ করা সম্ভব। অর্থাৎ, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কিছু পূর্বাভাস দিয়ে থাকে— যে পূর্বাভাসগুলি পরীক্ষাযোগ্য — পরীক্ষার ফলের সাথে পূর্বাভাস না মিললে প্রথমে পরীক্ষাপদ্ধতিটি সঠিক কিনা, পরখ করা জরুরী এবং পরীক্ষাপদ্ধতি যদি সঠিক হয় ও পূর্বাভাস পরীক্ষায় প্রমাণিত না হয়, তাহলে তত্ত্বটিই ভ্রান্ত; অন্তত, বিজ্ঞানের তত্ত্বের ক্ষেত্রে যাচাইয়ের এই নীতি গ্রাহ্য। প্রায়-অসীম-লঘুতার দ্রবণের তত্ত্ব সেই কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে আসতে পারছে কি? রাসায়নিক বিশ্লেষণে ঔষধ-দ্রবণে বিন্দুমাত্র ঔষধ-উপাদানের উপস্থিতির প্রমাণ না পাওয়া গেলে এবং হাজার ঝাঁকানোর পরেও ঔষধ-উপাদানের অনুপস্থিতিতে দ্রবণটির রাসায়নিক ধর্ম ঔষধের অনুরূপ না হয়ে উঠতে পারলে, প্রায়-অসীম-লঘুতার তত্ত্ব ভ্রান্ত প্রমাণ হয় না কি? হোমিওপ্যাথির গবেষকরা সেই সরল পথ মানতে না চেয়ে নিত্যনতুন পথ ধরে প্রায়-অসীম-লঘু দ্রবণের রাসায়নিক আচরণের বিচিত্র তাত্ত্বিক সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করছেন। অর্থাৎ, সরাসরি পরীক্ষার মধ্যে না গিয়ে কেন ও কীভাবে ঔষধ-উপাদানের অণুর অনুপস্থিতি সত্ত্বেও দ্রবণটির ওষুধে পরিণত হওয়া সম্ভব, সেই নিয়ে বিবিধ যুক্তি বা তথাকথিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অবতারণা করছেন — কেন? গবেষণার নামে সহজ-সরল রসায়নের পরীক্ষার পথ না ধরে জটিল তত্ত্বের অর্ধপাচ্য উদগারের অনুশীলন করছেন — কেন?

বিজ্ঞান এগোয় একটি তত্ত্বকে ধরে নিত্যনতুন পরিস্থিতিতে নিত্যনতুন পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে সেই তত্ত্ব হয় বাতিল হয়, নাহলে আরো মজবুত হয় — এটাই বিজ্ঞান। আর, একটি তত্ত্বকে স্থির ও অভ্রান্ত সত্য বলে মেনে নিয়ে, পরীক্ষানিরীক্ষাতে সেই তত্ত্বের ফাঁকফোকড় ধরা পড়লে, নিত্যনতুন ব্যাখ্যার মাধ্যমে যে-করেই-হোক সে তত্ত্বকে সত্য বলে খাড়া করে রাখার চেষ্টাটাই অবিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞান। নিজেদের চর্চার বিষয়টিকে সে জায়গায় এনে দাঁড় করাতে চাইছেন কেন হোমিওপ্যাথির ডাক্তারবাবুরা? জ্যোতিষ আমার চোখে কেন অবিজ্ঞান, তা বোঝাতে এই লেখার শুরুতেই উদাহরণ দিয়েছি, জ্যোতির্বিজ্ঞান বহু যোজন এগোলেও এবং নতুন গবেষণালব্ধ তথ্যের সাথে বিপ্রতীপ অবস্থান সত্ত্বেও, জ্যোতিষকে অভ্রান্ত বলে প্রমাণ করার চেষ্টার অভাব নেই। এমনকি, একটা বড় অংশের জ্যোতিষী জ্যোতির্বিজ্ঞানের

কিয়দংশ খাবলে তাকে জ্যোতিষের পক্ষে যুক্তি হিসেবে পেশ করে থাকেন। শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত হোমিওপ্যাথি ডাক্তারবাবুরা নিজেদের চিকিৎসাপদ্ধতিকে সেই পর্যায়ে নামিয়ে আনছেন কেন? পছন্দ হোক বা না হোক, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হোমিওপ্যাথির ডাক্তারবাবুরা বাধ্য। না, আইনত বাধ্যবাধকতার প্রশ্ন উঠছে না — এ বাধ্যবাধকতা মূলত নীতিগত।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে দীক্ষিত ডাক্তারবাবুদের হোমিওপ্যাথি নিয়ে যে অন্যতম প্রধান অভিযোগ — চিকিৎসার নামে সময় নষ্ট করিয়ে দেওয়া, সে বিষয়ে আর ঢুকতে চাইছি না। ক্যানসারের চিকিৎসা করি — কাজেই, এ অভিযোগের সারবত্তা হাড়ে হাড়ে অনুভব করার মতো অভিজ্ঞতা বিস্তর। এই লেখার মধ্যেই একজন ফোন করলেন, তাঁর মায়ের ডিম্বাশয়ের ক্যানসার, সফল অস্ত্রোপচারের পর কেমোথেরাপি নিতে বললেও 'বড্ড সাইড-এফেক্ট' ভেবে তাঁরা ও পথে যাননি, শরণাপন্ন হয়েছিলেন ব্যানার্জি মহাশয়ের — আট মাসের ধন্বন্তরি চিকিৎসার শেষে এখন মায়ের যায়-যায় দশা। অতএব, একটু অঙ্কোলজিস্ট দেখালে কেমন হয়! এমন অভিজ্ঞতা নেই, এরকম অঙ্কোলজিস্ট এদেশে খুঁজে পাওয়া যাবে না — ঠিক যেমন পিত্তথলির পাথর গলিয়ে ফেলা যাবে এই আশায় বছরখানেক হোমিওপ্যাথি ওষুধ সেবনের শেষে সরল অস্ত্রোপচারের জটিলতা বহুগুণ বাড়িয়ে ফেলে সার্জেন দেখাতে এসেছেন, সে অভিজ্ঞতা নেই, এদেশে এমন সার্জেন বিরল এবং আশ্চর্য ব্যাপার হল, উভয়ক্ষেত্রেই পরিজনের হতাশার অভিমুখটি থাকে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসকের প্রতি।গুরুত্বপূর্ণ সময়টা যিনি নষ্ট করে দিলেন, সেই হোমিওপ্যাথির উদ্দেশ্যে বক্তব্য সচরাচর — 'আসলে অসুখটাই খারাপ ধরনের, হোমিওপ্যাথি খাওয়ার সময় তো অন্তত সাইড-এফেক্টের কষ্টটা পায়নি অত!'

কিন্তু, আমার প্রশ্নটি আরো অনেক বুনিয়াদি পর্যায়ে — হোমিওপ্যাথির মুখ্য উপপাদ্যসমূহ আদৌ বিজ্ঞানের অনুসারী কিনা। গ্যারান্টি দিয়ে উপশম যাঁরা করে থাকেন, তাঁদের নাম আপনি লোকাল ট্রেনের কামরায় বা বিনামূল্যের শৌচালয়ের দেওয়ালে পেয়ে যাবেন। কিন্তু, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে অন্যতম স্বীকৃত অঙ্গ অনিশ্চয়তা — একই পর্যায়ের একই অসুখে একই চিকিৎসাপদ্ধতি নিপুণভাবে অনুসরণ করার পরেও সব রোগীর চিকিৎসার ফলাফল একই হয় না এবং এই ফলাফলের ফারাকটার কারণ, চিকিৎসকের গাফিলতি বা অপদার্থতা নয়; দায়ী আবারও বলি, চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত সেই অনিশ্চয়তা — মডার্ন মেডিসিনের ক্ষেত্রে কথাটা যেমন সত্যি, হোমিওপ্যাথি যদি বিজ্ঞান হয়, তাহলে সেই অনিশ্চয়তার যুক্তি তাঁদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কাজেই, চিকিৎসায় ভালো ফলাফল সবসময় পাওয়া যাবেই, এমন গ্যারান্টি নেই, হোমিওপ্যাথি যদি বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত চিকিৎসাপদ্ধতি হয়, তাহলে সে চিকিৎসায় সাড়া পাওয়া যায়নি বলে প্রয়াসটুকুকে সময় নষ্ট বলে দাগিয়ে দেওয়া যায় না। সুতরাং, বুনিয়াদী প্রশ্নটা হোমিওপ্যাথিতে বিজ্ঞানের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি নিয়ে। সে প্রশ্নের যথাযথ উত্তর মিললে বাকি প্রশ্ন বা অভিযোগের ফয়সালা অনুসিদ্ধান্ত মাত্র।

হোমিওপ্যাথি ডাক্তারবাবুদের প্রতি একটিই অনুরোধ — তাঁরা নিজেদের চিকিৎসাব্যবস্থাটিকে আরেকটু সচেতনতার সাথে গ্রহণ করুন। মডার্ন মেডিসিনের চিকিৎসকরা মানুন বা না মানুন, এদেশের অসংখ্য মানুষ হোমিওপ্যাথির কার্যকারিতা বিষয়ে আস্থাশীল। তাকে যাঁরা অশিক্ষাসঞ্জাত বলে দাগিয়ে দিতে চান, তাঁদের জানানো যাক, জনসাধারণের আস্থার ব্যাপারে ইউরোপের বিভিন্ন উন্নত দেশেও হোমিওপ্যাথি পিছিয়ে নেই। রহস্যটা কোথায়? শুধুই খরচ কম, এটুকুই? তথাকথিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ হোমিওপ্যাথদের ভিজিট কলকাতা শহরে সর্বোচ্চ ভিজিটের তালিকায় পড়তে পারে। তাহলে? কার্যকারিতা বলতে শুধুই প্লাসিবো কিনা, সেও আবারও খতিয়ে দেখতে অসুবিধে কীসের! আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের ডাক্তারবাবু বা হোমিওপ্যাথি ডাক্তারবাবু — আপত্তি তো কোনো তরফেই থাকার কথা নয়।

বড় বড় অসুখের কথা বাদ থাক, খুব সাধারণ উদাহরণ নেওয়া যাক - যেমন ধরুন আঁচিল এবং কড়া (warts and corn) — এই সমস্যায় একটি বিশেষ হোমিওপ্যাথি ওষুধ (যেটি মুখে খাওয়ার ও ত্বকে সরাসরি প্রয়োগ করা, দুরকমভাবেই ব্যবহৃত হয়) ব্যবহার করে সুফল পেয়েছেন, এমন দাবি অনেকেই করেন। কিন্তু, কয়েকজনের মুখের কথায় ভরসা না রেখে, হোক না ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল। প্রমাণ হোক, এই 'সুফল' শুধুই প্লাসিবো, নাকি তার চাইতে বেশি কিছু! প্রমাণ যদি পাওয়া যায়, গবেষণা হোক কী পথে এল আরোগ্য --- রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখা যাক, ঔষধ-উপাদানের উপস্থিতি কতখানি অতি লঘু দ্রবণ বা প্রায়-অসীম-লঘুতার দ্রবণ কি সত্যিই তেমন লঘু! বিজ্ঞান

বলতে এটাই। সে পথে না হেঁটে "এ অতি গভীর চিন্তনের ফসল অল্প কথায় বোঝানো যায়-না-র" যুক্তি নেহাতই অপযুক্তি ও উত্তর এড়ানোর অপপ্রয়াস মাত্র। হোমিওপ্যাথদের উদ্দেশে বলি, দুশো বছর কম সময় নয়, বিজ্ঞানের জগতে তো নয়ই। অণু বা পরমাণুর অস্তিত্ব প্রমাণ হয়েছে এই সবে গত শতকের শুরুতে। জিন-ডিএনএ-র কথা তো ছেড়েই দিন। সেখানে, দুশো বছর আগেকার কোনো চিকিৎসাদর্শন, সে দর্শনের উদ্ভাবক যতো উন্নত মেধার জিনিয়াসই হোন না কেন, একইভাবে উপযুক্ত ও প্রযোজ্য থাকতে পারে কি? থাকা সম্ভব? অতএব, সেই দর্শনের পিছনে সমকালীন বিজ্ঞানের লজ্জ ধার করে ছেঁড়াফাটা তাপ্পি লাগানোর চেষ্টা করে নিজেদেরকে লঘু করবেন না প্লিজ। ভাবনাটাই নতুন করে ভাবুন।

অসলার-এর উক্তি দিয়েই শেষ করব— "It is distressing that so many good men live isolated in a measure from the great body of the profession. The grievous mistake was ours: to quarrel with our brothers over infinitesimals was a most unwise and stupid thing to do." — না, এই উক্তির অনুবাদ করছি না আর।

আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা যে খুব স্বস্তিকর অবস্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এমন তো নয়। অনেক প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। যে পথ ধরে যেসব প্রশ্নের যেভাবে উত্তর খোঁজা হচ্ছে — প্রশ্ন সে নিয়েও। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান একটিমাত্র পথ ধরেই সমাধানে পৌঁছাতে পারবে কিনা সে নিয়ে, অন্তত বর্তমান লেখকের, সংশয় রয়েছে। অতএব, কথোপকথন জরুরি। জরুরি সবধরনের বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসাব্যবস্থার সহযোগিতা ও ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস। কিন্তু, ওই 'বিজ্ঞানসম্মত' শব্দটি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

মডার্ন মেডিসিনের যোগ্য সহযোগী বা গ্রহণযোগ্য বিকল্প বা উপযুক্ত প্রতিস্পর্ধী — যেভাবেই দেখুন না কেন, সে হিসেবে প্রমাণিত হতে গেলে যেকোনো চিকিৎসাব্যবস্থাকেই বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে আসতে হবে। হোমিওপ্যাথিও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়।

উমা

# বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও হোমিওপ্যাথি

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে হোমিওপ্যাথি সংক্রান্ত একাধিক গাইডলাইন, সুপারিশ ও মন্তব্য রয়েছে। সেগুলি খুঁটিয়ে পড়ে যে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা হল —

১) হোমিওপ্যাথিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একটি ঐতিহ্যবাহী (ট্র্যাডিশনাল) তথা পরিপূরক (কমপ্লিমেন্টারি) চিকিৎসা ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করে।[১]

২) যে সমস্ত দেশে সরকারিভাবে হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা প্রচলিত আছে সেখানে হোমিওপ্যাথির যথাযত নিয়ম নীতি প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণ করা দরকার বলে তারা মনে করে।[২]

৩) হোমিওপ্যাথি ওষুধ প্রস্তুতি, তার প্যাকেটজাত হওয়া ও লেবেলিং হওয়া, ওষুধটির বাজারজাত হওয়া, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক কর্তৃক রোগীকে হোমিওপ্যাথি ওষুধ বানিয়ে হাতে দেওয়া, বিভিন্ন হোমিওপ্যাথির ওষুধের দোকানের তাকে রেখে দেওয়া ও রোগীকে বিক্রি করা — এই প্রতিটি ধাপে ওষুধটির গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ (কোয়ালিটি কন্ট্রোল) এর ওপরে তারা বারবার জোর দিয়েছে।২

৪) অত্যন্ত লঘু দ্রবণের মধ্যে তাত্ত্বিকভাবে ওষুধের কোনো অণু-পরমাণু না থাকার কারণে তার থেকে সাইড এফেক্টের সম্ভাবনা কম থাকলেও যদি ওষুধটির বিভিন্ন ধাপে গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ না হয় তাহলে তাতে থাকা ইম্পিউরিটি ও অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থের উপস্থিতির কারণে ওষুধটি খেয়ে সাইড এফেক্ট হতে পারে। পাশাপাশি যে সমস্ত হোমিওপ্যাথি ওষুধ কম লঘু করে দেওয়া হয়, বা যেখানে সরাসরি মাদার টিঙ্কচার দেওয়া হয়, তাতে যথেষ্ট পরিমাণে সক্রিয় পদার্থ

থাকার কারণে তার থেকেও সাইড এফেক্ট হতে পারে।[২] এই কারণে হোমিওপ্যাথি ওষুধের নিরাপত্তা খতিয়ে দেখা সর্বদা জরুরি।

৫) ২০০৯ সালে আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত কিছু দেশে এইচ আই ভি ও টিবি রোগের চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথি ব্যবহার করা হলে তার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্দেশ দেয়- কোনো অবস্থাতেই টিবি, এইচ আই ভি, ম্যালেরিয়া, শিশুদের ডায়ারিয়া ও ফ্লু —এই পাঁচটি রোগের চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথি ব্যবহার করা যাবেনা, কারণ ঐ রোগে হোমিওপ্যাথির কার্যকারিতা প্রমাণিত নয়।[৩]

৬) সবশেষে হোমিওপ্যাথি ওষুধের নিরাপত্তা সংক্রান্ত দলিলে (ডকুমেন্ট) তারা ঘোষণা করেছে যে হোমিওপ্যাথি ওষুধের কার্যকারিতা এবং রোগ নির্বিশেষে তার ব্যবহারযোগ্যতা নিয়ে কিছু বলা থেকে তারা বিরত থাকছে।[৪]

১. World Health Organization*f* (2019). WHO global report on traditional and complementary medicine 2019. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/312342.
২. Safety issues in the preparation of homeopathic medicines. Publication date: 17 February 2010, Languages-English– ISBN:978 92 4159884 2
.৩. WHO warns against using homoeopathy to treat serious diseases. BMJ 2009; 339 doi:https://doi.org/10.1136/bmj.b3447 (Published 24 August ২০০৯)
৪. https://www.who.int/medicines/areas/traditional/prephomeopathic/en/

উমা

## পরিশিষ্ট : ১
### প্রমাণ এর স্তর (লেভেল অফ এভিডেন্স)

| | | |
|---|---|---|
| ১) গাইডলাইন | একাধিক মেটা অ্যানালিসিস ও সিস্টেম্যাটিক রিভিউ-এর ওপর ভিত্তি করে একটি নির্দিষ্ট রোগের চিকিৎসায় কীভাবে ধাপে ধাপে কী কী ওষুধপত্র দিয়ে চিকিৎসা করা হবে সেটি নিরূপণ করা হয়। | |
| ২) মেটাঅ্যানালিসিস ও সিস্টেম্যাটিক রিভিড | এই ক্ষেত্রে সরাসরি কোনো স্টাডি করা হয়না। কোনো রোগে কোনো চিকিৎসার কার্যকারিতা জানতে প্রথমে ওটির ওপর করা উচ্চমানের, পক্ষপাতহীন নির্ভরযোগ্য র‍্যাণ্ডমাইজড কন্ট্রোলড ট্রায়ালগুলিকে বেছে নেওয়া হয়। এরপর সেগুলিকে বিশেষ উপায়ে বিশ্লেষণ করা হয় যাতে করে ঐ সমস্ত ট্রায়ালগুলি থেকে একটি নির্দিষ্ট কমন প্যাটার্ন বেরিয়ে আসে। | হোমিওপ্যাথি ওষুধগুলির কিছু মেটা অ্যানালসিস হয়েছে যাতে দেখা গেছে হোমিওপ্যাথি প্লাসিবোর থেকে বেশি কার্যকারি নয়। |
| ৩) র‍্যান্ডমাইজড কন্টোলড ট্রায়াল | এই ভাবে কোনো ওষুধের কার্যকারিতা প্রমাণ করা হয়। প্রথমে রোগীদের যথেচ্ছভাবে দুটি দলে ভাগ করা হয়। একদলকে নতুন ওষুধটি দেওয়া হয়। অন্য দলকে দেওয়া হয় প্রচলিত, কার্যকারি ওষুধটি। কিছু বছর আগেও এদের প্লাসিবো ওষুধ দেওয়া হত। কিন্তু বর্তমানে প্লাসিবো দেওয়া অনৈতিক, কারণ প্লাসিবো দেওয়া মানে রোগীকে হাতের কাছে থাকা কার্যকারি ওষুধ থেকে বঞ্চিত করা। তাই নতুন ওষুধটিকে গৃহীত হতে গেলে তাকে প্রচলিত ওষুধের সমকক্ষ বা তাঁর থেকে বেশি কার্যকারি প্রমাণিত হতে হয়। | গত ২০-৩০ বছরে একাধিক দেশে হোমিওপ্যাথির কয়েকটি ওষুধকে নিয়ে দুশোর ওপর এই ট্রায়াল হয়েছে। এগুলির মতে হোমিওপ্যাথি প্লাসিবোর থেকে বেশি কার্যকারি নয়। |

| | | |
|---|---|---|
| | 'ব্লাইণ্ডিং'-এর মাধ্যমে রোগীকে জানতে দেওয়া হয় না তিনি কোন ওষুধটি পাচ্ছেন। ডাবল ব্লাইণ্ডিং এর মাধ্যমে ডাক্তার ও রোগী কাউকেই জানতে দেওয়া হয় না রোগী কোন ওষুধ পাচ্ছেন। | |
| ৪) কোহর্ট স্টাডি | এই ক্ষেত্রে বহুদিন ধরে একজন রোগীকে বা অনেক সময় কিছু সুস্থ মানুষকে পর্যবেক্ষণ করা হয়, যাদের মধ্যে কোনো রোগের একাধিক রিস্ক ফ্যাক্টর আছে যেগুলি ভবিষ্যতে সেই রোগটির জন্ম দিতে পারে। | |
| ৫) কেস-কন্ট্রোল স্টাডি | কোনো ক্রনিক রোগের কারণ বা রিস্ক ফ্যাক্টর জানতে এটি করা হয়। একবারের জন্যেই রোগীদের দেখা হয় ও কিছু প্রশ্ন করা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোগটি ঘটে যাওয়ার পর এই স্টাডিটি করা হয়। | কয়েকটি হোমিওপ্যাথি ওষুধের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি নেওয়া হয়। |
| ৬) কেস রিপোর্ট ও কেস সিরিজ | এগুলির মধ্যে রোগীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, কোনো চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা, বিশেষজ্ঞের মতামত, একই রোগের একাধিক লিখিত বিবরণ ইত্যাদি রয়েছে। | অধিকাংশ হোমিওপ্যাথি ওষুধের কার্যকারিতা এগুলির ওপর ভিত্তি করে ঠিক হয়। এগুলির মতে হোমিওপ্যাথি কার্যকারি। |
| ৭) ল্যাবরেটরি স্টাডি | ল্যাবরেটরিতে প্রাণীদের ওপর করা পরীক্ষা। এইভাবে কোনো ওষুধের ক্রিয়াকলাপ ও সাইড এফেক্ট সম্বন্ধে কিছু ধারণা পাওয়া যায়। | হোমিওপ্যাথিতে এই ধরনের স্টাডি করা হয়না। |

**মন্তব্য :**

১) সবথেকে নীচের স্তরে থাকা প্রমাণের গুরুত্ব সবচেয়ে কম। যত ওপরে যাওয়া যায় তত প্রমাণের গুরত্ব বৃদ্ধি পায়। সব থেকে ওপরে থাকা স্তরের প্রমাণ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণ— র‍্যান্ডমাইজড কন্ট্রোলড ট্রায়ালের গুরুত্ব কেস রিপোর্ট ও কেস সিরিজের থেকে অনেক বেশি।

২) মডার্ন মেডিসিনের সমস্ত রোগে ওপরে বর্ণিত সব রকমের স্টাডি হয়, কিন্তু ওষুধের কার্যকারিতা প্রমাণ করতে একমাত্র ডাবল ব্লাইণ্ড র‍্যান্ডমাইজড কন্ট্রোলড ট্রায়াল-ই করা হয়। কোন রোগে কোন ওষুধ ব্যবহার করা হবে তার জন্যে মেটা অ্যানালিসিস, সিস্টেম্যাটিক রিভিউ এবং গাইডলাইন মেনে চলা হয়।

৩) মডার্ন মেডিসিনে আগে ট্রায়ালে ওষুধের কার্যকারিতা প্রমাণ করতে হয়, একমাত্র তবেই সেই ওষুধ রোগীকে দেওয়া যায়। হোমিওপ্যাথিতে ট্রায়ালের মাধ্যমে কার্যকারিতা প্রমাণের আগেই ওষুধটি দিয়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে একাধিক স্বাস্থ্য সংস্থার চাপে ও বিভিন্ন নিয়মনীতি ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োগের ফলে হোমিওপ্যাথি ওষুধগুলির ট্রায়াল হচ্ছে, কিন্তু তাতে হোমিওপ্যাথির কার্যকারিতা প্লাসিবো বা প্রচলিত ওষুধের তুলনায় বেশি-এমন প্রমাণ হয়নি।

৪) হোমিপ্যাথির বেশিরভাগ র‍্যান্ডমাইজড কন্ট্রোলড ট্রায়ালগুলিতে একাধিক পক্ষপাতিত্বের চিহ্ন পাওয়া গেছে তথা ট্রায়ালগুলির নির্ভরযোগ্যতা কম থেকেছে।

**পরিশিষ্ট: ২**

**সুপারিশ এর শ্রেণীবিভাগ (ক্লাস অফ রেকমেণ্ডেশন)**

মডার্ন মেডিসিনে সব ওষুধেরই কিছু উপকারি কার্যকারিতা আছে এবং কিছু সাইড এফেক্ট আছে। শুধু মডার্ন মেডিসিন বলেই নয়, যে কোনো পদার্থ যা আমাদের শরীরে খাবারের সাথে, জলের সাথে শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে, শিরার মধ্যে, চামড়ার মাধ্যমে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি মাত্রায় প্রবেশ করে তার-ই সাইড এফেক্ট আছে। মডার্ন মেডিসিন সেটি জানে, সেটিকে গুরুত্বের সাথে বিচার করে, সেটির লক্ষণগুলিকে নজরে রাখে, সেটিকে যথা সম্ভব কম করা বা দূর করার জন্যে সর্বদা চেষ্টা করে।

মডার্ন মেডিসিনে দেওয়া সমস্ত ওষুধের উপকারিতা ও সাইড এফেক্ট আছে। কোনো রোগে কোনো ওষুধ দেওয়ার আগে সেটির উপকারিতা ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা ঝুঁকিকে তুল্য মুল্য বিচারে বিচার করা হয়। সেগুলির ওপর ভিত্তি করে ওষুধটি দেওয়া যাবে কিনা বা দিলে কতটা নিশ্চিন্ত হয়ে দেওয়া যাবে তা ঠিক করা হয়। একে বলে সুপারিশের শ্রেণীবিভাগ।

**প্রথম শ্রেনী (ক্লাস ওয়ান রেকমেণ্ডেশন)**— উপকার অনেক অনেক বেশি, ঝুঁকি নগণ্য। এই ক্ষেত্রে ওষুধটি দেওয়া উচিত।

**দ্বিতীয় শ্রেণী-(ক) (ক্লাস টু-এ রেকমেণ্ডেশন)**— যথেষ্ট উপকার রয়েছে, খানিক ঝুঁকি আছে। আরো স্টাডি করা দরকার, এই ক্ষেত্রে

ওষুধটি দেওয়াই যুক্তিযুক্ত হবে।

**দ্বিতীয় শ্রেণী-(খ) (ক্লাস টু-বি রেকমেণ্ডেশন)**— উপকার আছে তবে ঝুঁকিও প্রায় সমান আছে। আরো স্টাডি দরকার, এই ক্ষেত্রে পরিস্থিতি বিচার করে ওষুধটি দেওয়া যেতে পারে।

**তৃতীয় শ্রেণী (ক্লাস থ্রি রেকমেণ্ডেশন)** — উপকারহীন। কোনো উপকার পাওয়া যায়নি: চিকিৎসা করে লাভ হবে না।

**তৃতীয় শ্রেণী (ক্লাস থ্রি রেকমেণ্ডেশন)**- ঝুঁকিপূর্ণ। কোনো উপকার নেই, খরচ সাপেক্ষ ও ঝুঁকিপূর্ণ: রোগীর ক্ষতি হবে এই ওষুধে।

**উদাহরণ** : হার্ট ফেইলিওর রোগের চিকিৎসায় উচ্চ রক্তচাপ কমাতে অ্যামলোডিপিন ট্যাবলেট দেওয়া হল প্রথম শ্রেণীর সুপারিশ, যাতে উপকার অনেক অনেক বেশি, ঝুঁকি নগণ্য। কিন্তু এই রোগে উচ্চ রক্তচাপ কমাতে প্রাজোসিন ওষুধটি দেওয়া হল ঝুঁকিপূর্ণ তৃতীয় শ্রেণীর সুপারিশ, কারণ রোগীর ক্ষতি হবে এই ওষুধে।

**মন্তব্য :** যে কোনো ওষুধই যে শরীরে ঢুকলে তার যেমন উপকার থাকতে পারে তেমনই ঝুঁকিও থাকতে পারে। এই সার্বজনীন প্রাকৃতিক সত্যটি হোমিওপ্যাথিতে স্বীকার করা হয়না। হোমিওপ্যাথি মতে ঐ ওষুধে কেবল উপকারই হয় শরীরে কোনো ঝুঁকি বা সাইড এফেক্ট থাকেনা। তাই হোমিওপ্যাথি ওষুধের ক্ষেত্রে কোনো ক্লাস অফ রেকমেণ্ডেশন থাকেনা।

## পরিশিষ্ট : ৩

**ক্রনিক রোগের প্রকৃতি ও হোমিওপ্যাথিতে 'সিম্পটোম্যাটিক' চিকিৎসার সমস্যা**—

**মন্তব্য ১**-

উপরের ছবিটিতে যে ঢেউ খেলানো গ্রাফটি দেখানো হয়েছে বেশিরভাগ ক্রনিক রোগের ক্ষেত্রে রোগীর কষ্ট যন্ত্রণা সময় সাপেক্ষে ওইভাবেই ওঠানামা করে থাকে, উদাহরণ স্বরূপ অস্টিওআর্থরাইটিস বা রিউমাটয়েড আর্থরাইটিসের গাঁটে ব্যাথা, স্পন্ডাইলোআর্থরাইটিসের কোমরে ব্যথা, সোরিয়াসিস নামক চর্মরোগ, সুগার ও প্রেশারের সমস্যা (ওজন কমে যাওয়া, মাথা যন্ত্রণা, ঘুমের সমস্যা ইত্যাদি)-র কথা বলা যেতে পারে। এই সমস্ত রোগের ক্ষেত্রে যে কারণে কেবলমাত্র সিম্পটোম্যাটিক চিকিৎসা করলে শুধু সাময়িক কষ্ট লাঘবই হবে; কিন্তু তলায় তলায় রোগটি বেড়েই চলবে, আর মাঝে মাঝেই রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে। হোমিওপ্যাথিতে এই সমস্ত রোগগুলিকে আজকাল বিশেষ গুরুত্ব সহকারে চিকিৎসা করা হয়, তার কারণ ওপরের গ্রাফ থেকেই স্পষ্ট।

১) রোগটির সর্বোচ্চ যন্ত্রণা ভোগের কালেই রোগী হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের কাছে যাবেন, ঐ চিকিৎসকের দেওয়া ''জল/ অ্যালকোহল'' খেয়েই রোগী সুস্থ বোধ করবেন।

২) ক্রনিক রোগের কারণ ও চিকিৎসা মাল্টি ফ্যাকটোরিয়াল হওয়ায়, রোগী জীবনশৈলীর পরিবর্তনে অনীহা দেখানোয় ও কিছু রোগ প্রাকৃতিক নিয়মেই অনিরাময়যোগ্য হওয়ায় রোগীরা কখনোই পুরোপুরি সুস্থ বোধ করবেন না, তিনি ক্রমাগত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের কাছে আসতেই থাকবেন। ফলে তাঁর প্র্যাকটিশও চলতে থাকবে।